যন্ত্রণার নির্মাণ ও স্বপ্ন বিষয়ে

বিভাস চক্রবর্তী

স্যাস্ - বিভাসদা, আমি প্রথমেই আপনার কাছে যেটা জানতে চাইব সেটা হচ্ছে এই যে চল্লিশ বছরের ওপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে থিয়েটারের কাজ করছেন এবং এখনও সৃষ্টিশীল আছেন এর পেছনে মৌলিক তাড়নাটা কী ? মানে যন্ত্রণা, ক্রোধ, আকাঙ্খা, স্বপ্ন?

বিভাস - তাড়নাটা দুরকমের আছে । একটা হচ্ছে থিয়েটার নিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষা, নতুন ভাবনা - চিন্তা, নতুন পথখোঁজা এটা, কারণ আমাদের এখানে থিয়েটারটার কোন একটা ধারাবাহিকতা নেই। অর্থাৎ শিল্প আন্দোলনের মধ্যেযে ধারাবাহিকতা থাকে, এক একটি পর্যায় পেরিয়ে আসে, সামগ্রিকভাবে থিয়েটার আর একটা পর্যায়ে এসে প্রবেশ করে, সেই ধারাটা চলতে থাকে, আবার একটা পরিবর্তন আসে, অগ্রগতির একটা ধারা কিংবা অধগতির একটাধার তৈরি হয়। সেইজন্যে আমার সততই একটা মাথায় থাকে যে থিয়েটারটা কীভাবে, কী করে নতুন পথে কিংবা একটা নতুন রূপ, নতুন ভাষা দেওয়া যায় সঙ্গে সমসময়ের একটা যোগ আছে। এইটা নিয়ে নিরন্তর একটা চর্চা চালানো--- এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা হচ্ছে- সেটাই হচ্ছে হয়তো আরো বেশি কিংবা একই সঙ্গে আসে দুটোই, আমি জানিনা কোনটা আগে কোনটা পরে কোনটা কম কোনটা বেশি। সেটা হচ্ছে আমার কথা বলা। আমি যা মনে করছি, যা বলা দরকার সেই কথাগুলো বলা সেটা ভীষন জরি। কারণ আমার চারপাশে যা ঘটছে --- আমার পাড়াতে, আমার শহরে, আমার রাজ্যে, আমার দেশে, এই বিশ্ব-- সেই সমস্ত কিছুই আমাকে তাড়িত করে, ভাবায়, ক্রুদ্ধ করে, যন্ত্রণা দেয়। সেইগুলো আমার কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করার ইচ্ছেটা সবচেয়ে বেশি। এই দুটো জিনিসই আমাকে এখনও থিয়েটারে রেখেছে বলে মনে হয়।

স্যাস্ - এই যে যন্ত্রণার কথা বলছেন, ক্রোধের কথা বলছেন -- আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা বা ধারাবাহিকতার প্রসঙ্গে পরে আসছি। এই যে যন্ত্রণা বা ক্রোধ যেটা অন্যতম শক্তি আপনাকে আরো সৃষ্টিশীল রাখার জায়গায়, এই যন্ত্রণাটা - আপনি ধণ ঘাটের দশক বা পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে আপনি হয়ত থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। -- আপনার যে যন্ত্রণার চেহারাটা, আজকে যে ছেলেটা থিয়েটারে আসছে তার যন্ত্রণার চেহারাটা সেটার মধ্যে তফাৎ আছে। মৌলিক চেহারাটার তফাৎ আছে সেকথা আমি বলছি না। আমার মনে হচ্ছে আপনার ভেতরকার যন্ত্রণাগুলো, একদম বেড়ে ওঠা থেকে - যে যন্ত্রণা আমরা গ্রহণ করি, খানিক নির্মাণ করি আমাদের পরিপার্শ্ব থেকে, আমাদের বেঁচেথাকা থেকে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন থেকে সেইটার জায়গা থেকে আপনার যন্ত্রণার একটা সুস্পষ্টরূপ জেনে নেওয়াটা জরি আপনার থিয়েটারকে বোঝার জন্যে।

বিভাস - দেখ আমার মত মানুষ, যার জন্ম হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্-কালে ১৯৩৭ সালে। আমরা কী সামাজিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিয় পরিবর্তন কিংবা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছি। সবগুলোই কিন্তু ছাপ ফেলে বিশেষ করে সেই মানুষটা যদি নিজে সচেতন হয় এবং সে যে পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছে, সেই পরিবেশ যদি তাকে প্রভাবিত করে। আচ্ছা আমি তো একজন রাজনৈতিক মানুষের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলাম ; তিনি ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী। আমার বাবা ছিলেন কংগ্রেসী রাজনীতির, আর আমার মামার বাড়ি ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের রাজনীতির। উভয়ই স্বাধীনতা চেয়েছিলেন এবং স্বাধীনতার জন্যেই সংগ্রাম করেছেন। সুতরাং জন্মলগ্নেই এই রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো আমার চারপাশে ঘটতে দেখেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় - স্মৃতি যেগুলো মনে আছে-- মনে আছে সেখান দিয়ে আমাদের উত্তরপূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশ সেনা বাহিনী যাচ্ছে। তারা তাঁবু গেড়েছে আমাদের ওখানে। আমাদের বাড়ির পাশে তাদের ক্যাম্প। সাঁজোয়া গাড়ি চলেছে আমাদের রাস্তা দিয়ে, ট্যাঙ্ক চলেছে আমাদের রাস্তা দিয়ে, ট্রেঞ্চকাটা হয়েছে। এ. আর. পি. ছিল, এ. আর. পির লোকেরা ছিল। এ আর পি প্রেটেশান। ছাই রঙের পোশাক পরে ঘুরত। তা এসমস্ত তো দেখেছি। আমার মামা তখন আন্দামানে স্বদেশী ডাকাতি করেন। তারপরে বোধহয় পরে ফিরে এসেছেন। ৪২ এ দেখেছি আমাদের বাড়িতে বাবাকে এ্যারেস্ট করতে এসেচে -- ভোরবেলা সারা বাড়ি ঘেরাও করে পুলিশ। বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। জেলে দেখতে যেতাম বাবাকে। বাবা সেই -- এখন যাকে বলে বারমুডা টাইপের সেই স্ট্রাইপ দেওয়া শাদা প্যান্টের মত পরতেন ওপরে একটা হাফ হাতা নিমা মতন, যেখানে বাবাকে দেখতে যেতাম। তো এইগুলো দেখেছি। দেখেছি -- পাশাপাশি একটা শিল্পের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির একটা চর্চা দেখেছি সিলেট শহরে। প্রগতি লেখক ও

শিল্পী সংঘ দেখেছি। ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ দেখেছি, আমার বাবা ছিলেন তার সভাপতি। বাবা ছিলেন তাদের নেতা। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, এঁরা ছায়ানাটক করতেন। ১৯৪৬-এ নৌ বিদ্রোহ নিয়ে 'নীল সমুদ্র লাল হয়ে গেল', 'নাবিকের রক্তধারা', সে সব দেখেছি ছোটো বেলায়। আমাদেরই স্কুলে সে সব অনুষ্ঠান হত। সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক বছর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বছর, এক বছর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের বাড়িতে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এসে। আমরা দেখেছি ৪৬ এ কলকাতায় মামার বাড়ি এসে রশিদ আলি দিবস দেখেছি। রশিদ আলি দিবস নিয়ে বাবা নাটক লিখেছিলেন। সেই নাটক ওখানকার লেখক শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ -এর যাঁরা পূর্বসূরী তাঁরা করেছেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাতে সুর দিয়েছেন। আমি এই সমস্ত ব্যাপারগুলো চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ই বুঝতে পারি যে আমরা একটা পরাধীন জাত। এটাতো বুঝেছি এবং তার জন্য কি আপ্রাণ লড়াই করেছেন, আমার বাবা কিংবা মামাএবং তার সঙ্গে বহুলোক, বহুমানুষ। অর্থাৎ একটা পরাধীন জাতি আমরা এই বোধটা তো যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে তারপর থেকে বুঝতে শু করেছি। সুতরাং তার একটা রাগ, তার একটা যন্ত্রণা এগুলো তো ছোটবেলা থেকেই সঞ্চিত ছিল নিজের মধ্যে সমীকরণ সেটা হয়তো বুঝতে পারতাম না। নেতাজীর কথা শুনেছি, এদিকে গান্ধিজীর কথা শুনেছি কারণ আমার বাবা গান্ধিজীর শিষ্য। কিন্তু কোনটা ঠিক বেঠিক বোঝার তো সময় নেই তখন। সময় হয়নি তখন, তবে সবগুলোই আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য এই বোধটা অন্তত তৈরি হয়েছে। এবং তখন শুনেছি যে আমাদের বাবারা সরকারি স্কুলে পড়বেন না বলে কলেজের পর্ব ছেড়ে গিয়ে নতুন স্কুল তৈরি করেছেন। সেই স্কুলেই আমরা পড়তাম। জনশক্তি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আমার বাবা। বোধহয় বালগঙ্গাধর তিলক ছাড়া ভারতবর্ষের এগজিবিশনের জন্যে পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বাবাই দ্বিতীয় মানুষ যার বিদ্ধে ইংরেজ মামলা করেছিল সিডিশনের। অভিযোগ এনেছিল দেশদ্রোহিতার।

স্যাস্ - আপনার মা'ওতো আমি জানতুম জেলে ছিলেন।

বিভাস - হ্যাঁ, আমার মাও জেলে ছিলেন। বললাম তো মা মামার বাড়ির সবাই এবং মা বিয়ের পরেও জেলে গেছেন। তার পরে যেটা আকস্মিকভাবে একটা পট পরিবর্তন হল স্বাধীনতা, দেশভাগ। সেইটা --একদিকে যেরকম স্বাধীনতা সংগ্রামের গর্ব অনুভব করতাম, কারণ আমার বাবা, মা এবং পাশাপাশি যাঁরা তাঁদের লড়াই থেকে। ঐ বয়েসেইকেন জানি না দেশভাগের ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয়েছিল একটা বিশ্বাসঘাতকতার মত। এই যন্ত্রণাটা তারপর আজও পর্যন্ত এই বয়স অবধি আমি ভুলতে পারিনি। এবং আমাকে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে 'প্রমা'তে একটা লেখা লিখতে বলা হয়েছিল। আমি লিখেছিলাম যে, এটা আমার কাছে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর নয়। বিশ্বাসঘাতকতার পঞ্চাশ বছর। সেই লেখাটাতে আমি নিজেকে যে - যেখান থেকে উৎখাত হয়েছে, তার পরিবেশ থেকে তাদের জীবন জীবিকা থেকে, তাদের সাথে ভীষণ একাত্মবোধ করি। সে নর্মদার অধিবাসীবৃন্দের কথাই বল কিংবা ঐ আমাদের টালি নালা থেকেই বল-- যে যেখান থেকে উৎখাত হয়েছে তাদের যন্ত্রণাটা কী - নতুন করে আবার একটা জীবন শু - করা, হয়ত মাত্রার তফাৎ আছে। আমাদের ক্ষেত্রে মাত্রাটা বেশি, নর্মদার ক্ষেত্রে মাত্রাটা বেশি কিন্তু হয়তো টালিনালা থেকে যারা যাচ্ছে হয়তো মাত্রাটা ততটা নয়। কিন্তু তার কাছে তার অভিঘাতটা প্রায় একই রকমভাবে এসে পৌঁছোয়। তো সেখান থেকে এসে একদিকে যেমন ঐ দগদগে ঘাটা মনের মধ্যে ছিল। এবং বাবার যে কংগ্রেসী রাজনীতি তার প্রতি আস্তে আস্তে বিশ্বাস ভাঙতে ভাঙতে একটা জায়গায় এসেছে এবং পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গে এসে একটা বামপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং আমার কলেজ জীবনে যেটা একটা চুড়ান্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছল, কারণ আমি সেদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হই।

স্যাস্ - সেটা কোন সাল ?

বিভাস - ৫৩ সাল। সেই দিনই দেখলাম আমাদের ক্লাস হবার কথা যেদিন ক্লাস হল না হঠাৎ ক্লাসে ঢুকে, টেবিলেরওপর দাঁড়িয়ে, অত্যন্ত খর্বকায় একজন মানুষ বক্তৃতা দিলে অসাধারণ বাংলায়, আর সবাই ক্লাস ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। ট্রামের এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলনের জন্য। তিনি হচ্ছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং তখন থেকে বামপন্থী আন্দোলন এরং এটাই যে মানুষের মুক্তি--আসল কথা তো মানুষের মুক্তি। সেটা বুঝতে শিখলাম যে শুধু ক্ষমতা হস্তান্তরেই মানুষের মুক্তি হয় না। মানুষের মুক্তি আরো অন্য কিছু, সেইটা তখন আস্তে আস্তে বোধগম্য হল। বামপন্থী আন্দোলনের দিকে ঝুঁকলাম। আমি কখনই এস. এফ. করিনি কিন্তু এস. এফ. এর সমর্থক ছিলাম। আমি কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হইনি। সব সময়ই আমি আমার মতন করে আমার সমর্থনগুলো ঠিক করে নিতাম। সেটা জানান দেওয়ারও দররকার বোধ করিনি কখনও। কাজে কর্মে যদি পককাশ হয় তাহলে হয়েছে। প্রকাশ করারকোন তাগিদ অনুভব করিনি। এই বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন -এই ফ্যাসিবিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলন সেখান থেকেই কিন্তু এই থিয়েটার নতুন থিয়েটার নতুন সিনেমা নতুন রকমের ছবি, নতুন রকমের গান এইগুলোর আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

যন্ত্রণার কথা যেটা বলছিলে, এই যন্ত্রণাটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে চলতেই থাকে। এবং সেখানে যখন খাদ্য আন্দোলন এবং এই

একের পর এক বামপন্থী আন্দোলন ঘটতে থাকে--খাদ্য আন্দোলন তারপরে যুক্তফ্রন্টের আসা।৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট পড়ে যাওয়া। ৬৯ সালে আবার যুক্তফ্রট আবার পড়ে য়াওয়া। ৭১ সালে নির্বাচন, বামফ্রন্টের জয় কিন্তু তাদের সরকার গড়তে না দেওয়া। তরপরে ৭২ সালে সেই অদ্ভুত সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন এই সবগুলো থেকেই কিন্তু নিজের যন্ত্রণা এবং নিজেরা যা চাই, দেশটার আর যা হোক কিন্তু মানুষের মঙ্গলের জন্যে মানুষের মুক্তির জন্যে যা হওয়া উচিত সেটা যে হচ্ছে না, সেটা যে পাচ্ছি না। সংগ্রাম হচ্ছে আবার হারছি। আবার সংগ্রামহচ্ছে, এর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একদিকে যেরকম উদ্বুদ্ধ হয়েছি হতাশ হইনি কখনও। কারণ সামগ্রিক আন্দোলনটার মধ্যে হতাশা ছিল না এটাও ঘটনা। সামনে একটা লক্ষ্য ছিল, এবং সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য অসংখ্য মানুষ কাজ করেছেন, স্বার্থত্যাগ করেছেন, তাঁরা ছিলেন সব দৃষ্টান্ত। সেইজন্যে ঐ সময় যে আমরা-- এক হচ্ছে যে পারিবারিক ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের এক অদ্ভুত অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে কাটাতে হয়েছে, কিন্তু যখন সেই সময়টার কথা ভেবেছি কখনও ভাবিনি আমি খুব কষ্টে আছি, কষ্ট পেয়েছি। মনে হয়েছে এই তো জীবন, এই ভাবেই চলার কথা। কিন্তু যন্ত্রণাটা অন্য জায়গায়, নিজের ব্যক্তিগত স্তরে নয়। আমি কোনও একটি স্কুলে দু বছরের বেশি পড়তে পারিনি। এক স্কুল। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা। আমি ক্লাস নাইন থেকে টেনে উঠে প্রমোশন পেয়েছি কিন্তু ক্লাসের খাতায় নাম ওঠেনি টেনে। আমাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে হয়েছে প্রোমটেড টু ক্লাস টেন কারণ নাইন-এ একটা বছর মাইনে দিতে পারিনি। সেইজন্য আমাকে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এগুলো কিন্তু কখনও মনে হয়নি।

স্যাস্ - আসলে বোধহয় বিভাসদা সে সময় দারিদ্রেও একটা অহংকার ছিল।
বিভাস - বোধহয়।

স্যাস্ - এখন দারিদ্রকে আমরা হীন চোখে দেখি। অবশ্য দারিদ্র বলতে আমি অর্থনৈতিক দারিদ্রের কথাই বলছি অন্য দারিদ্রর কথা না। এই জায়গাটায় বিভাসদা, এই যে চারদিকে একটা আন্দোলন, সর্বস্তরে, তার ব্যর্থতা, সাফল্য, বিশ্বাসঘাতকতা সব নিয়ে এই যে একটা স্বপ্ন দেখাচ্ছে, যার চারে দারিদ্রও একটা অহংকার হয়ে উঠছে -- এটা কি একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি দায়বদ্ধ করেছে আপনাকে ? মানে ধন থিয়েটারের বাইরে মানুষ হিসেবে আপনার যে জীবন--- ধন চাকরী করেছেন যেখানে সেখানে যে লড়াই আপনার রাজনৈতিক অবস্থানটা কী ছিল?

বিভাস - হ্যাঁ, দেখো আমার রাজনীতি কী আমি ডিফাইন করতে পারি না, পারব না। কারণ সত্যি কথা বলতে কী আমি এই বামপন্থী আদর্শ এবং মার্কসবাদী চিন্তাধারা নিয়ে যারা কাজ করেছেন তাদের মতবাদ এবং কাজকর্ম দেখে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, এ কথা সত্য। কিন্তু আমার রাজনীতি বোধহয় যেখানেই দেখেছি যে আমার মনে হয়েছে, অন্যায়, আমার মনে হয়েছে ঠিক নয় সেখানে সেই প্রতিবাদে সামিল হওয়াটাই আমার রাজনীতি হয়েছে এবং সেইজন্য হয়তো বা অনেক সময় কোন তকমা লাগানো কোন পার্টির সঙ্গে চিরকাল অন্ধভাবে সেঁটে থাকতে পারিনি, পারব না। সবচেয়ে ভাল বলা চলে যে, যখন নকশালবাড়ি আন্দোলনের নকশালবাড়ি রাজনীতির সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ ঘটে তখন, আমি এই নকশালবাড়ি রাজনীতি যারা করেন তাদের অনেক কথা অনেক কাজ একদিকে যেরকম ঠিক বলে মনে করেছি, আবার অন্যদিকে তাদের বিরোধিতাও করেছি। আমি যেখানে কাজ করতাম --- এ. জি. বেঙ্গল। এ জি বেঙ্গলটা একটা রাজনীতির আখড়া ছিল। সেখানে থেকে আমরা ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। তিনবার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছি। একবার চাকরিও চলে গিয়েছিল।
স্যাস্ - একটু বিশদ জানতে চাইছি।

বিভাস - আমার নামে পুলিশ রিপোর্ট হয়েছে। ধর ১৯৫৮ সালে আমি এ জি বেঙ্গলে ঢুকি। এ জি বেঙ্গলে ঢুকে ৬০ সালে তখনও পারমানেন্ট হইনি, কোন কিছু চিন্তা - ভাবনা না করে--আমার যে আয় , তা যত সামান্যই হোক তারওপর কিন্তু আমার পরিবার নির্ভরশীল; সেগুলোর কোন তোয়াক্কা না করে, ভাবনা চিন্তা না করে মনে হয়েচে এটা ঠিক, যোগ দিয়েছি। চাকরি চলে যাবার নোটিশ জারি হয়েছে, এক মাসে নোটিশে আমাদের চাকরি চলে যাবে। তারপর যাই হোক, অশোক মেটা এবং ফিরোজ গান্ধী এদের সঙ্গে নেহে দয়াপরবশ হয়ে কোন ভিকটিমাইজ্-ড করলেন না। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ছেড়ে দিলেন। তারপরে আবার চাকরি ফিরে পেলাম। তা নাহলে কিন্তু আমি অন্য চাকরি জুটিয়ে ফেলেছিলাম। আমি ঐ বাটানগর হাইস্কুলে জিওগ্রাফির টিচার হয়ে চলে যেতাম। নিয়োগপত্রওপেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাই হোক আবার এ জি বেঙ্গলেই থেকে গেলাম কারণ কলকাতায় আমার থাকা দরকার। আর কলকাতায় থেকে থিয়েটারের চর্চাটা করা দরকার আমার।
স্যাস্ - সে সময় পাশাপাশি থিয়েটারটাও চলেছে?

বিভাস - হ্যাঁ, থিয়েটারটাও চলছে, ছোট মাপের, পাড়ার গ্রুপে। এবং আমার ইচ্ছা তখন আরো বড় জায়গায় যাওয়ার। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির মেম্বার হয়েছি, এই চর্চাগুলো ব্যাহত হবে সেই জন্যে আমি থেকে গেলাম এ জি বেঙ্গলেই। আর এ জি বেঙ্গলে যা পরিবেশ তাতে রাজনীতি এরং সংস্কৃতির একটা বিরাট পরিমণ্ডল ওখানে, আমার সহায়ক মনে হয়েছে। তারপরে ১৯৬৮ তে আবার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলন, সেবারও যোগ দিলাম।সেবারও চাকরি গেল না, কিন্তু শাস্তি পেয়েছিলাম আমরা। তারপর ১৯৭৪ সালেও তাই। অর্থাৎ কাজের জায়গায়ওকিন্তু এই আন্দোলনের সংগে নিজেকে যুক্ত করেছি। আজকে বলি ঘটনাটা, ১৯৭৪ সালে আমি যখন দুরদর্শনের ট্রেনিং -এ পুণায় যাই, পুণাতে আমায় কতকগুলো এক্সারসাইজ করতে হত। আমি নিউজে পড়েছিলাম তখন এ্যাজিটেশন চলছিল পুণা মিউনিসিপ্যালেটিতে। মিউনিসিপ্যালেটির বিদ্ধে একটা এ্যাজিটেশন চলছিল, তার কর্মীরা - কোথাকার এমনি বস্তি- টস্তির মানুষরা। তখন আমি সেটাকে তুলে আনি, ওইটাই আমার এক্সারসাইজ হয় নিউজ আইটেমের। এটা যখন তুলে আমি তখন ওরা জানতে পেরে যায় যে এটা ফিল্ম টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইণ্ডিয়া থেকে তুলে নিয়ে গেছে। ওরা এখানে পুলিশ পাঠায়। এবং সে নিয়ে একটা হৈ চৈ কাণ্ড বেধে যায়, লেখা লেখি হয়। এই গণ্ডগোল পাকাচ্ছি যখন আমি পুণায়, তখন এ জি বেঙ্গল আকাশবাণীকে চিঠি লিখছে--- তখন তো দূরদর্শনের কাজটা হত আকাশবাণীতে। আকাশবাণীতে চিঠি লিখে জানাচ্ছে যে বিভাস চক্রবর্তীকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছেভুল করে--- একজন স্ট্রাইকার এবং মুচলেকাও দেয়নি, তাই ওকে ফেরৎ পাঠানো হোক। পরে এ নিয়ে আরো গণ্ডগোল হয়েছে পুলিশ রিপোর্ট এই সেই। আমার পারমানেন্ট কন্ট্রাক্ট - এ গণ্ডগোল হয়েছে, দেয়নি পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে।

সত্যজিত রায়কে বলে অনেক জল ঘোলা করে, তারপরে আমি পারমানেন্ট কনট্যাক্ট পেয়ে যাই। সত্যজিৎ রায় নিশ্চয় সিদ্ধার্থশংকর রায়কে বলেছিলেন আমার কথা, আমার নাম করে। যার জন্যে আমার সংগে দূরদর্শনের গণ্ডগোল হল। সেটা রাজনৈতিক নয় ততটা, কিন্তু একটা নৈতিক ব্যাপার ছিলই তার মধ্যে। কলকাতার দূরদর্শন -এর ভূমিকা খর্ব করা হচ্ছিল রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের নামে--এমন কি ইংরেজি নিউজ ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের প্রোগ্রামযখন - তখন ছাঁটাই করা হত ওখান থেকে। এবং দুরদর্শনে আমাকে যখন চিঠি পত্র-র উত্তর দেওয়া দায়িত্ব দেওয়া হল, তখন কিন্তু ওই চিঠিপত্র'র উত্তর দিতে গিয়ে আমি এগুলো বলতাম-যে আমাদের কোন হাত নেই। দিল্লি থেকেজানিয়ে দিয়েছে তাই আমাদের এই অনুষ্ঠানটা করা সম্ভব হয়নি, বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এইগুলো নিয়ে আমার ক্যাসেট নাকি দিল্লি পর্যন্ত গেছে। দিল্লীতে কমপ্লেন গেছে আমি নাকি সরকারের বিদ্ধে কথা বলছি, এবং সেই ক্যাসেট দিল্লিতে গেছে তারা দেখেছেন, পরীক্ষা করেছেন, তারপর, তখন আমাদের এখানে একজন বাঙালি মিনিস্টার ছিলেন দূরদর্শনের দায়িত্বে, তার কাছেও নানা রকম রিপোর্ট গেছে আমার নামে। তিনি তখন খড়গহস্ত হয়ে আমি যাতে কলকাতায় থাকব কি থাকব না তা কোনওমিনিষ্টার ঠিক করতে পারে না। চাকরি ছেড়ে দিলাম। এক দিনের জন্যেও যাইনি যেখানে বদলি করে পাঠিয়েছিল সেই দিল্লীতে। এর বাইরেও ধরো, ধরো - প্রবীর দত্তকে যখন পিটিয়ে মারল আমি গ্রুপ থিয়েটার পত্রিকার একটা সংখ্যায় দেখেছিলাম--- আমি তো বেশ সংগ্রামী লোক ছিলাম। সব জায়গায় স্বাক্ষরে প্রতিবাদ লিপিতে মিটিং -এ আমার নাম রয়েছে। তারপর ধরো নকশালদের সংগে প্রাতিষ্ঠানিক কমিউনিস্টদের যে বিরোধ সেখানে অনেক জায়গায় অনেক ঘটনায় আমি আসলে বিষয়গুলোকে আবেগের জায়গা থেকে দেখি---প্রতিত্রিয়াগুলো অনেক বেশী আবেগনির্ভর। তাতে হয়তো রাজনৈতিক তত্ত্বের দিক থেকে ভুল থাকতে পারে। বলা যেতে পারে যে এ লোকটার কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। সেটাও বলতে পারে লোকে। আমি আবেগের জায়গায় থেকে দেখি কতকগুলো মানুষ তো সত্যি মানুষের মুক্তির কথা ভেবে নিজেদের জীবন দিয়েছে। ঠিক যেরকম স্বাধীনতা সংগ্রামে, তাদের কথাও ভাবি । 'আমার মৃত্যু না হত্যা' তে সেই জন্যে যখন আমি একটা গান ব্যবহার করি-মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হল বলিদান। নকশালদের প্রসঙ্গে এই গান গাওয়া যেতে পারে কেউ ভাতবতে পারে না। কিন্তু আমি সেটাই ব্যবহার করি, কারণ আমার কাছে তখন সব এক হয়ে যায়। এই আত্মদান ব্যাপারটা এক হয়ে যায়। যে তখন যারা আত্মদান করেছে তাঁদের সঙ্গে এই নকশালদের আত্মদান, এবং শুধু নকশাল নয় বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে আরো অনেকে যারা জীবন দিয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে নকশালদের কথাই মনে পড়ে। ৭০ -এর দশকের কথা বলতে গেলে যে তখন আমি ওটাতে (মৃত্যু না হত্যা) দেখাই এবং আলোতেও দেখাই, যদি আলোর কথা মনে থাকে তোমাদের জানি না। যে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' পেছনে যে জানলার বাইরে কয়েকতলা উঁচু একটা বাড়ি ঘর দেখাই, পেছনে আকাশের মত থাকে শাদা সাইক্লোরামা সেখানে একটি আলো এসে প্রথমে একটু তেরঙ্গা মত পড়ে তারপর সেটা আস্তে আস্তে লাল হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি এই স্বাধীনতা সংগ্রামও দেখেছি। তাদের দেখেছি, সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার মাতুলালয় এবং পিত্রালয় তাদের সবাই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । আবার আমি নিজে আমার চোখের সামনে বামপন্থী আন্দোলন দেখেছি। আমার চেতনার উন্মেষ হয়েচে যখন তার সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর সাথে একাত্মবোধ করেছি। সেখানে মৌলিক জায়গায় বেসিক জায়গায় দেশপ্রেম, দেশের মুক্তি, মানুষের মুক্তির জায়গায় আমি তখন ওই খুঁটি - নাটি, কার কী পথ ভুল অমুক ভুল, তমুক ভুল বিচার করার মত রাজনৈতিক মেধা বা পাণ্ডিত্য আমার নেই। যার জন্যে আমার কাছে নেতাজী একজন বড় নেতা। সত্যি নতাজীকে আমি মানে কী বলব বাঙালী হিসেবে পুজো করি। তিনি কি ফ্যাসিস্তদের সংগে যোগ দিয়েছিলেন কি না জানি না, তারলক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের মুক্তি। আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস যদি বল তুমি, রাজনৈতিক অবস্থ

ান উল্টো পাল্টা---

স্যাস্ - সেটা দর্শক পাঠকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া যাক বিভাস দা। আমার আলোচনার একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে এসে আমি বলতে পারি নির্মাণ যদি একটা রসায়ন হয় তাহলে তার বিবিধ কেমিক্যালগুলোর হদিশ খানিক পাওয়া গেল। কিন্তু এই যে আপনার বলবার কথাটা তৈরী হোল -- ক্রমাগত তৈরী হচ্ছে-- সেটা আপনি বলবেন থিয়েটারে-মাধ্যম হিসেবে থিয়েটার কেন?

বিভাস - কেন থিয়েটারে বললে প্রশ্ন করতে হয় -- কেন থিয়েটার ছাড়া আর কিসেই বা? আমি কি একজন বড় প্রাবন্ধিক বা তাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা করে কথাগুলো বলতে পারব? আমি কি একজন ঔপন্যাসিক যে উপন্যাসের মাধ্যমে গল্পের মধ্যে দিয়ে বলতে পারব? আমি কি একজন কবি যে কবিতার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করব? আমার মনে হয়েছিল যে, থিয়েটারটা কিছু পারি। ছোটবেলা থেকেই তার প্রতি আকর্ষণ, তার প্রতি ভালবাসা, মুগ্ধতা এরকম বড় হয়ে থিয়েটার করব এরকম একটা ভেতরে ভাবনা চিন্তা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং থিয়েটারটাই আমার মাধ্যম হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে এটাই সত্য যে আমি ফিল্মেও আকৃষ্ট হয়েছিলাম। অজিতেশবাবু একসময় বলতেন, ও বিভাসবাবু থিয়েটারে থাকবেনা, ও ফিল্ম করবে। অবশ্য সঠিক হয়নি তাঁর ভবিষ্যতবাণীটা। কিন্তু এটাই মানে---
স্যাস্ - এটাতো আশঙ্কা থেকে বলেছিলেন। থিয়েটার বিভাস চক্রবর্তীকে হারাবে---

বিভাস - হয়তো বা তাই। জানিনা। তো এই ব্যাপারটা তখন কিন্তু আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ফিল্ম করতে পারি। কিন্তু দেখলাম যে আমার দ্বারা ফিল্ম করা সম্ভব নয়। তার নানান আনুষঙ্গিক ব্যাপার আছে যেগুলো নিজেকে ছোট করতে হয়, মাথা নিচু করতে হয়। দোরে দোরে ঘুরতে হবে টাকার জন্যে। অনেক বড় টাকার ব্যাপার এটা। আমার সামনে থিয়েটারের ব্যাপারে কতগুলো দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, থিয়েটারটার কিন্তু পুঁজিটা হচ্ছে ক্ষমতা ভাবনা চিন্তা, এটাই হচ্ছে পুঁজি। আর্থিক পুঁজির দরকার হয় না। সেই জন্যে আমি শেষ পর্যন্ত থিয়েটারেই টিঁকে গেলাম। তাছাড়া থিয়েটারটা তো আমি পাশাপাশি শিখছি। আমি সঠিক থিয়েটার শিখতে চেয়েছিলাম যার জন্যে একটা সুযোগ পেলাম বহুরূপীতে যাওয়ার, শিক্ষার্থী হিসেবে ১৯৬১ সালে। আমি ৬১ সালে বহুরূপীতে গেলাম। ছয় মাস সেখানে ছিলাম। কিন্তু যতটা আশা নিয়ে গিয়েছিলাম, সে আশা পূরণ হয়নি। শম্ভু মিত্রকে কাছ থেকে দেখার, তিনি কী করে কাজ করেন। কী করে একটা নাটক মঞ্চায়িত হয় তার পদ্ধতি, যে প্রসেস সেটা দেখার সুযোগ পাইনি। তারপর বহুরূপী থেকে বেরিয়ে কোথায় শিখি, কোথায় শিখি - সে সময় আকস্মিকভাবেই নান্দীকারের অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। তাঁর আমার একটা প্রতিযোগিতার নাটক দেখে আমাকে ভাল লেগেছিল। আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই নাটক কিভাবে তৈরি করতে হয়, একটা নাটক স্ক্রিপ্ট তৈ রি করা থেকে শু করে মঞ্চে সেটা দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়, সেই পুরো পদ্ধতিটা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। বিশেষ করে দুটো নাটক তৈরি দেখেছি একটা হচ্ছে 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' -এর শু থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। চেকভ-থেকে তিনি রূপান্তর করলেন। তারপর সেটা এডিট করলেন। তারপর সেটা মহড়া হল। সেটি ডিজাইন, হল। অভিনয় হল, অভিনয় শেখাচ্ছেন। সমস্ত কিছু লক্ষ্য করেছি শিক্ষার্থী হিসেবে। অংশগ্রহণ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে এটাও চলেছে। তারপরে 'যখন একা'। পরবর্তী প্রযোজনা 'যখন একা' তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম অভিনেতা হিসেবেও বটে আর ওই পাশে থেকে কাজটা দেখেছি পুরোপুরি। সেখানেও সেই রূপান্তর থেকে শু করে একদম মঞ্চায়ন অবধি পুরো প্রসেটা লক্ষ্য করেছি। এই টেকনিক্যাল নলেজটা আমার দরকার ছিল, যে একটা নাটক কীভাবে চূড়ান্ত রূপ পায় মঞ্চে। সেখানে আমি নিজেকে একজন শিক্ষিত নাট্যকর্মী করে তোলার চেষ্টা করেছি। সেই নাটক ছাড়া, থিয়েটার ছাড়া নিজেকে অন্য কোন মাধ্যমে যোগ্য বলে মনে করিনি কখনও। আর ভেতর থেকে কোন সেরকমের তাগিদ আসেনি, একমাত্র চলচ্চিত্রের ব্যাপারে ছিল। কিন্তু এটা বলি আমার কৈশোরের প্রেমিকা ছিল থিয়েটার, যৌবনের প্রেমিকা ছিল ফিল্ম। কিন্তু ঘর বেঁধেছি কৈশোরের প্রেমিকার সঙ্গেই। যৌবনের প্রেমিকার অনেক আবদার অনেক চাহিদা সেইগুলো মেটাবার মত ক্ষমতা আমার ছিল না।

স্যাস্ - তাহলে আপনার বলবার কথাটা আপনি বসালেন কৈশোরের প্রেমিকার মুখে। রসায়নটা কি? মানে এই যে আপনার রাজনীতিকে দেখা, সামাজিক ইস্যুগুলোতে ইননভল্বমেন্ট, পরিবারে আপনার অবস্থান, মানে মোটামুটিভাবে আপনি মানুষটার যে আপন--- তার রসদ নিয়ে তৈরি হচ্ছে যে কথা - সেটা থিয়েটারের ভাষায় ট্রানস্লেট করেছেন কীভাবে-- তার রসায়নটা কী?

বিভাস - আমি যখন একটা কাজের মধ্যে দিয়ে গেছি তখন বুঝতে পারিনি য়ে সেই সময়ের রাজনীতি বা সমাজ কীভাবে আমার থিয়েটারে এসেছে। কিন্তু পরে যখন তাকাই তখন দেখতে পাই এর মধ্যে একটা পরিষ্কার ধারাবাহিকতা রয়েছে। একটা দুটো এদিকে ছুটকো ছ

াটকা যেগুলো কী বলব মূল্যের যোগ্য নয় সে কাজগুলো বাদ দিলে। সেগুলো নানা প্রয়োজনে অবসরের কাজ বলে ধরতে পারো আর কি। আমি আগেই বলেছি যে আমি শিক্ষার্থী হিসেবে কোন বড় পরিচালকের কাছাকাছি থেকে কাজ প্রত্যক্ষ দেখে নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। নিজেকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এটা ঠিক যে আমি যখন থিয়েটারটা নিজে করব বলে ঠিক করেছি তখন কিন্তু আমার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী, বোধ, আমি কী বলতে চাই এবং কীভাবে বলতে চাই সেগুলো কিন্তু তখন একটা পরিণত স্তরে গিয়ে পৌঁছছে। অর্থাৎ সেখানে আমার পূর্বসূরীদের অনুকরণ করা, শিল্পগত দিকথেকে অনুকরণ করার কোন প্রশ্নই আসে না। আমি আমার মতই থিয়েটার করব যার সংগে আমার পূর্ববর্তী যারা থিয়েটার করেছেন তাঁদের হয়তো কোন মিলই থাকবে না। হয়ত কেন, থাকবে না। এবং সেখানে প্রত্যক্ষভাবে অজিতেশের সঙ্গে কাজ করলেও, অজিতেশের যে বলার কথা, অজিতেশ যে কথা বলতে চাইতেন কিংবা অজিতেশ থিয়েটারের যে রূপটা বা ভঙ্গীটা দেখেন আমি কিন্তু সে ভঙ্গীটা অনুকরণ করার চেষ্টা করিনি কখনও অনুকরণ করার তো নয়ই। আমার মনে হয়েছে যে আমার থিয়েটারটা আমার মতই হবে। আমি যত ছোট মাপেরই হই। যার সঙ্গে আমার পূর্ববতী অনেক বিরাট মাপের মানুষেরও কোন মিল থাকবে না। ভেতরের নাট্যবিজ্ঞান কিংবা নাট্যতত্ত্বের সঙ্গে একটা মিলও সামগ্রিভাবে সবার মধ্যেই থাকবে, সে গিরিশ ঘোষ থেকে আরম্ভকরে আজও যারা থিয়েটার করেছেন তাদের মধ্যেও আছে। স্তানিস্লাভস্কি থেকে শু করে আজও যারা থিয়েটার করেছেন তাদের মধ্যেও আছে। কিন্তু যে রূপে সে দর্শকদের সামনে হাজির হবে সেই রূপটা নিতান্তই আমার হবে, আমার সৃষ্টি হবে। এই ব্যাপারটা সব সময়ই আমার মধ্যে কাজ করত। আমারব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেই বোধহয় এটা ছিল। কারণ দুটো দৃষ্টান্ত দিই, আমাদের অল্প বয়সে, যৌবনে একটা প্রবণতা ছিল রবীন্দ্রনাথের মত করে হাতের লেখাটা করা, রাবীন্দ্রিক। আমি সব সময় তার বিরোধী ছিলাম। আমি ঐ বয়সেও যাতে রাবীন্দ্রিক না হই তার চেষ্টা করেছি। কিংবা আমাদের থিয়েটারের ঐ সময়কার মানুষদের দেখবে কথাবলার ধরনে একটা অন্যরকম--- তারা খুব সুন্দর কায়দা করে কথা বলত, তাদের বাচনের মধ্যে উচচরণের মধ্যে কণ্ঠস্বরের প্রক্ষেপণে তারা কিন্তু একটু অন্যরকমভাবে কথা বলতে ভালবাসত। তারা য়ে অন্যদের থেকে ভিন্ন সেটা হয়তো তাতে প্রমাণিত হত, একটু আলাদা। মানুষ সমীহও করত তাদের। আমার কাছে ওটা গ্রহণীয় ছিলনা। আমি কিন্তু সাধারণভাবে য়েরকম বাড়িতে কথা বলি, বাইরেও কথা বলি এবং বক্তৃতা মঞ্চেও সেভাবে কথা বলবার চেষ্টা করতাম। তাতে হয়তো আমার বলার বা বাচনের য়ে ব্যঞ্জনাধর্মীতা কিংবা অনেক অলংকার থেকে মুক্ত থাকত, কিন্তু এটাই আমার ধর্ম বলে মনে করেছি।

স্যাস্ - এটা কেন করতেন ?

বিভাস - অন্যরা যা করেছে সেটা আমি করব না।

স্যাস্ - শুধুকি তাই, না আপনার মনে হত যে ঐ সালংকার ও সুললিত কৃত্রিম বাচনভঙ্গী বিষয় থেকে উৎসারিত নয়।

বিভাস - মনে হত নিশ্চয়। মনে হত এই কৃত্রিমতাটা কেন ? আমি একজন শিল্পী বলে ব্যক্তিগত জীবনে হাতের লেখায় কিংবা কথা বলার ভঙ্গীতে স্বাতন্ত্র্য এনে নিজেকে স্বতন্ত্র প্রমান করব কেন? আমার স্বাতন্ত্র্য যদি কিছু থাকে সেটা হবে আমার কর্মে, কাজে। সেটা মঞ্চে যে জিনিসটা মানুষ দেখতে পাবে তার মধ্যে। সেই জন্যে সব সময় এটা ছিল আমার লক্ষ্য। ওটা ভেতরকার, আজকে হয়ত খোলাখুলি বলছি, কিন্তু এটা ভেতরে পুষে রাখতাম।

স্যাস্ - বিভাসদা বহুরূপীর প্রযোজনায় বোধহয় এই রকম ব্যঞ্জনা কী বলব একটা তৎসম ভাব - উচচারণ-এর ব্যাপারটা অনেক বেশি বেশি আসত। সুতরাং ঐ জায়গা থেকে আপনি একটা শিফ্ট করেছেন। তার কারণটা আপনি একটু বলুন?

বিভাস - কারণটা এটাই যে এরকম ভাবে করতে হবে কেন? আমি যখন একটা নাটকে একজনকে হাসতে বলি কিংবা কাঁদতে বলি, আমি বলি তুমি থিয়েটারে যে কান্না দেখেছো সেভাবে কাঁদতে যেও না। তুমি ঠিক এই মুহূর্তে চরিত্রটা যেভাবে কাঁদতে পারে, লজিক্যাল মনে হয়, যুক্তিপূর্ণ মনে হয় সেভাবে কাঁদো। কারণ থিয়েটারে হাসি আছে. থিয়েটারের কান্না আছে, থিয়েটারের ডাক আছে, এটা কোরো না। এটা আমি প্রত্যেকটা ব্যাপারে বলি যে থিয়েটারে আবেগপূর্ণ কথা থাকলে, একটা ধারা ছিল যে কথাগুলো বলার মধ্যেও আবেগ নিয়ে আসা। কিন্তু আমি বলি যে উল্টো দিক থেকে দেখ। যদি আবেগ থেকেই থাকে তাহলে কতখানি আবেগ না এনে বলতে পারো --- দেখবে তার এফেক্ট অনেক বেশি আসবে। ঠিক যেরকম রাজরক্ত নাটকে ছিল, খুব ভারি ভারি কথা ছিল-- এরকম একটা লোক বলে, যেখান থেকে তার রিয়ালাইজেশন হয় সেখান থেকে সেই লোকটা বলে। একটা যুবক যুবতীকে বলে যারা লড়াই করছিল প্রতিষ্ঠানের বিদ্ধে অস্ত্র হাতে, তারা বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল। তাদের ঐ কথা বলে একটা লোক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। খুব ভারি ভারি কথা ছিল। আমি দেখলাম যে এই কথাগুলো যদি খুব ভারি ভারি বলি তাহলে খুব জ্ঞান জ্ঞান মনে হবে। ঐ চরিত্রটা মাতাল ও মদ খেয়ে এসে কথাটা বলে এবং তখন সে অত্যন্ত খেলো ভাবে কথাগুলো বলে। এবং খেলোভাবে কথাগুলো বলার জন্যে আমার মনে হয়েছে অনেক বেশি এফেক্টিভ। আর একটা জিনিসআমার মধ্যে বোধ হয় ছিল, জানিনা। সেদিন 'এবং ঋতুপর্ণ'তেও ঠিক একথাই বলার চেষ্টা করেছি। যে আমার মধ্যে ফোক, লৌকিক ব্যাপারটাই বোধহয় বেশি কাজ করত। যেহেতু আমি সিলেটের লোক।

স্যাস্ - আমি ঠিক এই জায়গাটাই ধরতে চাইছি। আপনার থিয়েটারে ফোক ব্যাপারটা একটা অন্যমাত্রা আনে।

বিভাস - লোক শিল্পের চর্চা লোক সংগীতের চর্চা খুব প্রবল ছিল। আজকে যে এখানে নাটক করা লোক দেখছ, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী, দীনেন্দ্র চৌধুরী, খালেদ চৌধুরী, হীরেন ভট্টাচার্য, রণেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এরা সব সিলেটের লোক। বুঝতে পেরেছো আবার কলকাতায় এসে একটা আরবান ফোকের সঙ্গে আমার --- আমি দমদমের মানুষ, সাধারনের মধ্যে একেবারে দোকানদার, অমুক, এই সেই রিক্সাওয়ালা এবং এখানেও (এখন উনি গল্ফগ্রীনের বাসিন্দা) আমাকে দেখবে যে বাজারের লোকের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে রঙ্গ রসিকতা মজা ঠাট্টা ইয়ার্কি, এই রিক্সা স্ট্যান্ড এই রিক্সাওয়ালাদের সঙ্গে - এই যে আর্বনিটির ব্যাপারগুলো, চলচিচত্রর, অমুক এই যে সফিসটিকেড মিডিয়ামসব মিলিয়ে এই রূরাল ফোক এরং আরবান ফোক আমাকে প্রভাবিত করে। তাদের ভাষা, তাদের মত করে বলা সাধারণ লোকের মত বলার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে কাজ করে। বলতে ভাল লাগে আমার। যার জন্যে দেখবে যে আমি একদিকে যেমন কাজটা করি আবার অন্যদিকে তেমন শোয়াইক করি। শোয়াইক কিন্তু আরবান ফোকের একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ। এবং সেই দুটো চরিত্রই আমার কাছে ভীষণ প্রিয়, করতে খুব ভাল লাগে আমার। আমার কাচে বয়াতির পার্টটা--- 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'-র, করতে ভীষণ ভাল লাগে আমার। আমার চরিত্রটাই তাই। আমার চরিত্রটা খুব শিষ্ট, ভদ্র, রূচিসম্পন্ন উচচবর্গের তার উচচারণ শৈলী থেকে আরম্ভ করে তার জীবনচর্চা এই সমস্তর সঙ্গে বোধহয় একটু কম মেলে। আই এ্যাম নিয়াবার টু দ্যাট ক্লাস, আর কি। যার জন্যে হয়তো বড় চরিত্র রঘুপতি আমি করতে পারিনি। কিংবা গালিলেও তে সাগ্রেদআমি ভাল করতে পারিনি ! এটাও একটা কারণ। এগুলো কারণ তার মানে এই নয় যে আমি অভিনয় করতে পারিনি সেটা আমার চরিত্রের জন্য হয়তো। কিন্তু অভিনয় করাতে পারব না তা নয়। মঞ্চে অন্যকে দিয়ে করাতে পারব আমি ওটা, তখন অমি অভিনয় শিক্ষক হিসেবে--- সেই ধারণাগুলো, সেই ব্যাপারগুলো আমার আছে।

স্যাস্ - আমার মনে হয় আপনি একটু বিনয় করে বলছেন। এই যে আপনার সিলেটে বেড়ে ওঠা। আপনার অনেক বেশি ফোক রাল বলুন আরবান বলুম তার ক্লোজ হওয়া এটাকে আপনি যে জায়গা থেকে ধরছেন আমার মনে হচ্ছে যে আসলে আপনার ভেতরে নিশ্চয় এটা ছিল। যেটা আপনি বলছেন না স্পষ্ট করে সেটা হচ্ছে যে এই যে সুসংস্কৃত একাট মঞ্চায়ন সেটা দর্শকের সঙ্গে নাটকটার একটা দূরত্ব তৈরী করে। সেই দূরত্বটা হয়ত আর একটা লেবেলেএকটা পারপাস সার্ভ করে। সেটাকে আমি ছোট করছি না কিন্তু। কিন্তু আপনার বোধহয় মনে হয়েছে ঐ জায়গাট া ছেঁটে যদি এই জায়গাটায় আসি যে জায়গাটায় আপনি আপনি, তাহলে অনেক বেশি যোগাযোগ তৈরি হয় দর্শক আর থিয়েটারের মধ্যে।এবং সেটাই আপনার থিয়েটারের অন্যতম ভিত্তি। থিয়েটার করার এই যে বিশেষ ফর্ম আপনার, যেটা আমার স্পষ্টতঃ অনুভব করি আপনার নাটক দেখতে দেখতে, এই নিয়ে তো বোধহয় সিরিয়াসলি আপনার থিয়েটার দর্শন বা আপনি কীভাবে থিয়েটারকে দ্যাখান কী ফর্মে থিয়েটারকে দ্যাখেন সেটা শোয়াইক হলেও তার ছোঁয়া থাকে। মাধব হলেই যে সেটা ফোক হয়ে যাচ্ছে শুধু তাই নয়, শোয়াইকেও সেটা কী ভাবে আসবে এইটা--এইটা নিয়ে বোধহয় আপনি সিরিয়াসলি লেখেন নি কোথাও। আমি তো দেখিনি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে একটা আঁচ আমি পাচ্ছি যে এইটা আপনার একটা বিশেষ থিয়েটারের দর্শন। আপনি যে ফর্ম -এ কাজ করেন তার একটাসূত্র আমরা পাচ্ছি, তার একটা যুক্তি কাঠামো পাচ্ছি।

বিভাস - হয়ত তাই। আলোচনাটা আমাকেই বা করতে হবে কেন। নিজের কাজ সম্পর্কে নিজেই আলোচনা করব আর অন্যেরা...
স্যাস্ - আমার বিভাসদা একটা কথা এখানে। আসলে আমার মনে হয় যে সত্যি কথা বলতে কী আমাদের দেশে যারা থিয়েটারটা করেছেন --- আমরা বিদেশের প্রচুর লোকের থিয়েটার মেকিং -এ তার দর্শন নিয়ে প্রচুর আলোচনা করেছি। ধন গর্ডন ত্রেগ একভাবে করছেন সেটা নিয়ে তুমুল আলোচনা করি কিংবা ব্রেখ্ট্, স্তানিস্লাভসকি, দারিও ফো-কে আমরা আলোচনা করি তার বিশেষ ফর্ম নিয়ে। কিন্তু আমরা বোধহয় এই বেসিক ফান্ডামেন্টাল, মৌলিক জায়গাটার ওপর এক একজনের থিয়েটার দাঁড়িয়ে আছে-শম্ভু মিত্রের থিয়েটার দাঁড়িয়ে আচে, উৎপল দত্তর থিয়েটার দাঁড়িয়ে আছে, অজিতেশের থিয়েটার দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা বিভাস চত্রবর্তীর থিয়েটার; এই জায়গাটা নিয়ে বোধহয় খুব সিরিয়াসলি আমরা কাজ করছি না। এই জায়গাটাতে বোধহয় থিয়েটার আমাদের বাংলা থিয়েটারে যারা কাজ করছি, অভিনয় করছি, মঞ্চ করছি বা ডিরেকশন করছি তা নয় তার বাইরেও যারা ত্রিটিক, যারা প্রাবন্ধিক যারা এই নিয়ে রিসার্চ করছে তারাও বোধহয় এই জায়গাটায় খুব সিরিয়াস নয়।

বিভাস - একেবারেই খাঁটি কথা। এই দায়িত্বটা কেউ পালন করে না। এক একটা প্রোডাকশন দেখেন সেটা নিয়ে হৈহৈ করেন কিংবা সেটার নিন্দা করেন সেইখানেই দায় শেষ। একটা প্রোডাকশনের বিচার হয় হয়তো। এর বেশি যে একটা সামগ্রিকভাবে পুরো থিয়েটারের ধারা যদিও আমার থিয়েটারে আমি প্রথমেই বলছি ধারাবাহিকতাটা নেই।

স্যাস্ - আপনি কিন্তু খানিক আগে বলেছেন পিছন দিকে তাকালে দেখতে পান আপনার কাজের ধারাবাহিকতা রয়েছে।
বিভাস - আসলে সামগ্রিকভাবে থিয়েটারের ধারা কিংবা একটা মানুষের কাজ -এর ধারা সামগ্রিকভাবে ধরার চেষ্টা, পরিশ্রম, মানসিকতাই নেই। আমি তো দেখি না।
স্যাস্ - আপনার কি এটা মনে হয় না যে এটা আমাদের একধরনের হীনমন্যতা -- পিটার ব্রুকের থিয়েটার হতে পারে কিন্তু বিভাস চক্রবর্তীর থিয়েটার হতে পারে না ?

বিভাস - হ্যাঁ, হতে পারে, একটা জাতি যখন নিজেকে পরাজিত মনে করে, হেরো মনে করে, হীনমন্যতা তো সে জায়গা থেকে আসে। সে যদি মনে করে থিয়েটারটা আমাদের সমাজে একটা গুত্বপূর্ণ দিকই নয়। সমাজেতে। সেই অর্থে তো থিয়েটারের স্বীকৃতি রাষ্ট্র দেয়নি। সমাজও দেয়নি। থিয়েটারটা কিছু মানুষের - আমি চিরকাল সেটা বলে আসছি--- না হলে সাধারণ রঙ্গালয় এভাবে শেষ হয়ে যায় না, বুর্জোয়ারা আমাদের দেশে থিয়েটারটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। অন্য দেশে বুর্জোয়ারা করেছিল বলে থিয়েটারটা চলছে কিন্তু কিছু মানুষের ব্যক্তিগত শ্রম, ব্যক্তিগত ত্যাগ, প্রতিভা নিয়ে কিন্তু থিয়েটার চর্চা চলেছে। এখানে থিয়েটারটা সামগ্রিকভাবে একটা ধারা তৈরী করতে পারেনি কখনওই। এটা স্পোর‍্যাডিক বলব, স্পোর‍্যাডিক। ব্যক্তি বিশেষেব কাজের ওপর নির্ভর করেছে। সেই জন্যে সেটাকে ধরার চেষ্টা করাটা কঠিন, কিন্তু তবুও এক একটা মানুষ ধরে করলে হয়তো হত। তুমি ঠিক কথা বলেছ আমি তো কোন ছার, আমি তো সামান্য ক্ষুদ্র মানুষ। শম্ভু মিত্র নিয়ে- শম্ভু মিত্রের প্রশংসা করা হয় ভুরি ভুরি কিন্তু কেন করা হয় সেই তার বিশ্লেষণ করা ক্ষমতাও হয়ত নেই কিংবা পরিশ্রমও নেই সেই সাধ্যও নেই। একমাত্র বোধহয় কুমারদা কাছাকাছি থেকে কাজ করেছিলেন বলে কুমারদার লেখায় কিছু পাওয়া যায় তাছাড়া আর কেউ কাজ করেছেন ? করেননি। উৎপল দত্ত সম্পর্কে --- উৎপল দত্ত খুব বড় ডিরেক্টর ছিলেন এ তো আমরাও জানি। উনি কল্লোল করেছেন। কল্লোলে কি সুন্দর দেখেছি, এটা বলেই খালাস। এই ধরনের কোন স্টাডি যে করা হয় না, তা আমার বিষয়ে কী ভাবে ! আমি আমিই না। হতেই পারে না। তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে আমি যদি এখন তুমি যেটা বললে আমার কাজগুলোর মধ্যে আমার জীবন, আমরা রাজনীতি বোধ সমাজের বোধ কী ভাবে এসেছে। আজকে যদি রেট্রোস্পেকটিভে তুমি যদি নাটকগুলো দেখ বলতে পারি - ধর 'রাজরক্ত'। রাজরক্ত সময়টা কি, সত্তর দশক। সত্তর সালে পুজো সংখ্যায় বহুরূপীতে বেরিয়েছিল গিনিপিগ নামে সেটা ৭১ সালের জানুয়ারী মাসে করেছিলাম রাজরক্ত। সেই রাজরক্তে দেখাচ্ছে যে যৌবন, ইউথ কি করে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, সেই প্রতিষ্ঠান শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নয়, রাষ্ট্র শক্তি নয়, তার যারা সহায়ক শক্তি পারিবারিক কাঠামো, মিডিয়া এবং অন্যান্য নানাভাবে, নানাদিকে যেরকম সেইগুলো এই রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখছে, সেইগুলোর বিদ্ধে এই যৌবন লড়াই করছে। বারবার আঘাত করছে, কিন্তু আঘাত তার লক্ষে পৌঁচচ্ছে না এই কারণে যে তারা ঐক্যবদ্ধ নয়। তারা জনগণকে সঙ্গে নিতে পারেনি এবং সেইখানে ঐটা -- আসে তারা বারবার তাদের ছুরি তুলছে এবং সত্তর সালে চুরি প্রতিবাদ, আঘাত, রাষ্ট্র শক্তির ওপর আঘাত, পরিবার তন্ত্রের ওপর আঘাত যে সমস্ত আইকন মূর্ত্তি ছিল, সেই মূর্ত্তিগুলো ভেঙ্গে দেওয়ার এই যে প্রচেষ্টা সেটা বারবারই ব্যর্থ হচ্ছে। এই কারণে। সুতরাং লড়াইটাও সত্য ব্যর্থতাটাও সত্য, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে যদি কেউ কিছু করে। আমার শিক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। জ্ঞান দেওয়ার দরকার নেই, কিন্তু সেই ছবিটা তুলে ধরেছিলাম। যে বাইরে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার। সেইজন্যে রাজরক্ত ইউথের কাছে এতটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। ইউথকে উদ্দীপ্ত করেছিল রাজরক্ত। এবং ফর্মের দিক থেকেও সেখানে আমি এর আগে রাজনৈতিক নাটকের যে ফর্ম প্রচলিত, রাজনৈতিক নাটক বলতেই লোকে বলে উৎপল দত্তর নাটক, আর রবীন্দ্রনাথের নাটক বললেই বলে শম্ভু মিত্রের। এই যে কতগুলো অদ্ভুত রক্ষণশীলতা আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রেও কাজ করে, সেগুলো বড় পীড়া দিত আমাকে। আমি রাজনৈতিক নাটক অনেকগুলো করেছি, কোনটার সঙ্গে উৎপল দত্তের থিয়েটারের কোন মিল নেই। আমি সরাসরি রাজনৈতিক নাটক বলব 'রাজরক্ত', আমি বলব 'ভিয়েৎনাম'---আমি নিজে লিখেছি। আমি বলব শোয়াইক গেল যুদ্ধে, আমি বলব তোমার অদ্ভুত আঁধার কিংবা জোছনাকুমারী এগুলো সবই বলতে পারি, কোনটাই সেই উৎপল দত্ত ভঙ্গীতে-- 'মৃত্যু না হত্যা' একেবারেই অন্য প্রকরণে আমার থিয়টোরটা সাজানো। এবং এইটাই ইচ্ছে হয় যেটা বলেছিলাম আগে যারা করেছেন তাদের পথে না হাঁটা। তারপরে দেখো 'চাক ভাঙ্গা মধু'। ওই সত্তরের দশকেই তখন এই জমি নিয়ে লড়াই চলছে। ভূমিহীন কৃষকদের লড়াই চলছে। যেটা বামফ্রন্ট এসে ৭৭ সালে অঅপারেশন বর্গা করল। কিন্তু তার আগে পটভূমি ঐটাই, ৭০-এর নকশাল আন্দোলন। তারপরে এই ভূমিহীন কৃষকের কথা এবং সেখানে জোতদারের শোষন, জোতদারকে হত্যা করা। এবং চাকভাঙ্গা মধু কিন্তু সেই সময়ের একটা দলিল বলা চলে। সেই সময়ের এবং এই আমাদের মাতলা কিংবা জটা, এরা হচ্ছে ভূমিহীন কৃষক। এবং অঘোর ঘোষ সেই জোতদার কিন্তু কখনই সেটা উচচকিতভাবে একটা স্লোগানের নাটক, তথাকথিত গণনাট্যের প্যাটার্নে তথাকথিত রাজনৈতিক নাটকের প্যাটার্নে। উৎপল দত্তের সরলীকৃত নাট্যের পাটার্নের মধ্যে ফেলা যায় না সেটাকে। সেটা একটা মানবিক দলিল হয়ে ওঠে।
স্যাস্ - কিন্তু এটাকেও আপনি রাজনৈতিক নাটক বলবেন?

বিভাস - একশবার রাজনৈতিক নাটক, একশবার রাজনৈতিক নাটক এবং প্রকরণের দিক থেকে সেটা একবোরে রিয়ালিস্টিক, ন্যাচারা লিস্টিক নয় কিন্তু রিয়ালিস্টিক। ওটাতে যেরকম আমি একটা পোয়েটিক নাটককে তার নানারকমভাবে তাকে সাজিয়ে তার মধ্যে দিয়েও আমার ম্যাসেজটা স্পষ্টভারে প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেখানে বাস্তবতার সঙ্গে আপাতভাবে তার কোন মিল নেই। কিন্তু ম ানুষ আইডেন্টিফাই করতে পারছে ফোর্সেসগুলো সঠিকভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারছে। সে এক নতুন বোধ ব্যবহার করে আমি ন াটকটা করার চেষ্টা করেছি। ঠিক তেমনি 'চাক ভাঙ্গা মধু' একটা রিয়ালিস্টিক নাটক। সেইটা, আমাদের যেটা ট্রাডিশন রিয়ালিস্টিক ন াটকের, সেই ট্রাডিশন্যাল ফর্মে কত জোরদার নাটক করা যায় অভিনয়ে, মঞ্চপরিকল্পনায়, আলোতে, মূলত অভিনয়ে এবং সেখানে আ মি বলব আজকে মায়া ঘোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, মানিক রায়চৌধুরী এবং আমি এ নাটকটায় যে অভিনয় করেছিলাম যে অভিনয় অ াজকে আর আমি কাউকে দিয়ে করাতে পারব না আমি নিজে যদি প্রযোজনা করি. অন্য অনেক হয়ত ক্ষমতাশালী পরিচালক এসেছেন তারা হয়ত করাতে পারবেন। আমি কিন্তু করাতে পারব না। কারণ অভিনয়টায় প্রাণ ছিল, আমরা যেহেতু অভিনেতা অভিনেত্রী হিসেবে অনেকটাই ম্যাচিওর ছিলাম। তার জন্যে আমাদের প্রথম অভিনয় থেকে ১৯৭২ থেকে ১৯৮৫র শেষ অবধি সেই মনটা ধরে রাখতে পেরেছিলাম, প্রতিটি অভিনয়ে। অভিনয়ের যেটা ধর্ম হওয়া উচিত নাটকের ক্ষেত্রে, যে প্রতিদিনই মনে হবে নতুন, প্রতিদিনই। এইটা গেল, আবার দেখো মানে কি ভাবে আসে আবার ১৯৭৮-এ আমি করলাম 'মহাকালীর বাচ্চা', তার আগে ১৯৭৪ -এ করলাম 'আখ ামা'। তখন কিন্তু নকশাল বাড়ির আন্দোলন নিঃশেষিত, শেষ হয়ে গেছে ৭৪-এ। তখন কিন্তু নকশাল বাড়ি আন্দোলনের পূনঃ মুল্য ায়নের একটা চেষ্টা চলছে চারধারে। মনোজের মূল্যায়নে সেই আখামাতে এল যে অন্ধতা, খড়গ হাতে নিয়ে অন্ধভাবে কে শত্রু কে মিত্র ন া চিনে হত্যাতে লিপ্ত হওয়া । ভ্রাতৃহত্যায় লিপ্ত হওয়া, পরবর্তী প্রজন্মকে হত্যায় লিপ্ত হওয়া, এই য়ে মূল্যায়ন এটা আখামা নাটকে মহ াভারতের ঐ পর্ব অষ্টাদশ দিনে, কুক্ষেত্রের শেষে। এই ব্যাপারটার সঙ্গে কিন্তু অনতিপূর্বের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটা অদ্ভুত মিল। সেই মূল্যায়নটা করা হয়েছিল আখামায় । সেটা আবার অন্যরকমভাবে আখামাকে মঞ্চের দিক থেকে মানে প্রযোজনার দিকে থেকে কর ার চেষ্টা করেছিলাম। তার মধ্যে একটা ক্ল্যাসিক্যাল austerity।

স্যাস্ - কাব্যময় ছিল ?

বিভাস - ক্যব্যময়, সংলাপগুলো খুব কাব্যময় ছিল। এখনও যখন আমার শ্রুতিনাটক হিসেবে আখামা করি, লোকের ভীষণ ভাল লাগে। একঘন্টা ধরে যখন নাটকটা পাঠ করা হয় তখন লোকের ভীষণ ভাল লাগে। কারণ লোকে আইডেন্টিফাই করতে পারে। লোক ভেতরে ঢুকতে পারে। সেটা মঞ্চের প্রযোজনা হিসেবে বেশিদিন চলেনি, সফল হয়নি। কিন্তু সেটা করার চেষ্টা করেছিলাম। ১৯৭৮ সালে 'মহাক ালীর বাচ্চা' আমি বলব যে 'রাজরক্ত'-র মত নাটক কিংবা 'আখামা'র মত নাটকের প্রযোজনা যে রূপ ছিল সেরকমটা কিন্তু আর কেউ করেনি। আগেও করেনি পরেও করেনি । আমি যার জন্যে বলি আমার আগে কেউ করেনি এরকম কাজই করতে আমার ভাল লাগে। ত ার মানে কি আমি চাক ভাঙ্গা মধু করব না ? নিশ্চয়ই করব। আমার মত করে করব। 'মহাকালীর বাচ্চা' ছিল আর একটা--- সেটা একদিকে যেমন ছিল নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার চুড়ান্ত, তেমনি নাটকের বিষয়বস্তুর দিক থেকেও-সেটাতেও কিন্তু আমরা ঐ সত্তরের দশকের কথাগুলো পাই। একজন নিরন্ন উপবাসী, যাদের খাওয়া জোটেনা এরকম একটা পরিবার--- সে লুকিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ খেত। কালীঠাকুরের। একটা জমিদার-জোতদারের বাড়িতে ঢুকে, ঠাকুরের নৈবেদ্য সাজিয়েছে, সেখান থেকে চুরি করে খেতো। এই রকম এক মেয়ের গর্ভে একটা সন্তান জন্ম নিল, যারনখ দাঁত, যে আঁচড়ে খেতে পারে, কামড়ে খেতে পারে। এটা একটা অদ্ভুত প্রতীকি নাটক লিখেছিল মোহিত । যে গরীব ঘরে এরকম সন্তানের জন্ম হওয়া উচিত, যারা আঁচড়ে খেতে পারে,কামড়ে খেতে পারে। কারণ তাদের কেউ খেতে দেবে না। তাদের এই সমাজ , এই অর্থনীতি, এই ব্যবস্থা তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেনি। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা নেই। সুতরাং এখানে বাঁচতে হলে কিন্তু তোমাকে নখ, দাঁত নিয়ে বাঁচতে হবে। সেই যে অদ্ভুত একটা চেহারা যাকে আমরা দেখি না মঞ্চে, কিন্তু তার দাপট চারদিকে অনুভব করি, সে কাঁপিয়ে দিচ্ছে তার এই গোটা গ্রামটাকে, প্রাশাসনকে, বাইকে থেকে লোক আসছে, এবং তাকে ধরবার জন্যে চারপাশে নানা রকমের সন্ত্রাস ব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে,রাষ্ট্রব্যবস্থা সজাগ হয়ে উঠেছে। এটা কিন্তু ঐ সময়ের একটা প্রতিফলন, ভীষণভাবে। এটা করতে গিয়ে আমি নানা রকমভাবে, মঞ্চসজ্জার দিক থেকে, কোরাসের ব্যবহার দিক থেকে নানা রকমভাবে পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেছি।পরবর্তীকালে আমার ভাল লাগে যখন দেখি সেই প্রভাবটা অন্যদের মধ্যে কাজ করছে। (আমরা তো এখন খুব নাট্যভাষা-নাট্যভাষা বলি)

স্যাস্ - বিভাসদা, রাজনৈতিক নাটক বিষয়ে আপনার ধারণাটা আমি স্পষ্ট করে জানতে চাইছি, মানে আমি যেটা বলতে চাইছি। সাধ ারণভাবে রাজনৈতিক নাটক বলতে বোঝায় যে রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি তার বিরোধীতা কিংবা সেগুলো যারা কন্ট্রোল করেছে সেই ক্ষমতা, ত ার যে দ্বন্দ্ব, তার ভেতরকার পারস্পরিক সম্পর্ক এইগুলো নিয়ে কাজ করলে সেটা রাজনৈতিক নাটক। যেমন উৎপল দত্ত করেছেন কল্লোল বা এরকম কিন্তু এর বাইরে আমি বলতে চাইছি যে ক্ষমতার স্তরবিন্যাস সেটা সবজায়গাতেই রয়েছে। আমাদের সমাজের

প্রতিষ্ঠানে ইভ্ন পরিবারের মধ্যে স্বামী স্ত্রী তাদের ক্ষমতার স্তরের ভেদ আছে। তাদের এই যে ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরের ভেতরকার যে স
ম্পর্ক সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিবাহ থেকে আরম্ভ করে পরিবার পর্যন্ত সব জায়গাতে। সেগুলো নিয়ে আমি যখন ডিল
করব নাটকে সেগুলোকে কি আপনি রাজনৈতিক নাটক বলবেন ?

বিভাস - অবশ্যই বলব কারণ শুধু রাজনৈতিক নাটক নয়। রাজনৈতিক থিয়েটার নয়। থিয়েটার বস্তুটি নানারকমের হতে পারে। ত
ারমধ্যে নানা বৈচিত্র থাকতে পারে, বিষয়ে, ভাবনা চিন্তায়, তার কাহিনীগত কাঠামোর। নানারকমের হতে পারে। আমারা এটা ভুলে য
াই, যার জন্যে আমাদের নাটকের ধারণাগুলো বড্ড সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক থিয়েটার বলতে হয় উৎপল দত্ত না হয় ব্রেখ্ট্। এইরকম অ
ামরা ভাবি, কিন্তু রাজনৈতিক নাটক যে কতরকমের হওয়া সম্ভব সেগুলো আমরা চোখ কান খোলা রেখে বাইরের বিটা দেখিনা, ন
াটকের ইতিহাস দেখি না। আমাদের দেশেই যে নাটকের চর্চা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে সেটাও ভাল করে অনুধাবন করার চেষ্টা করিনা।
উৎপল দত্ত বলতেন--- যেহেতু রাজনৈতিক থিয়েটারের গু বলে মানা হয় তাঁকে, আমরাও মানি। উৎপল দত্ত বলতেন যে আমি একটা
প্রচারক। এটা সত্য যে উৎপলদা একটা বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিাসী ছিলেন। এবং সেই বিশেষ মতবাদ থেকে, বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গ
ীতে তিনি সমাজকে, রাষ্ট্রকে তার যে ক্ষমতাগুলো সেইগুলোকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাদের দ্বন্দ্বতাদের সংঘাত ইত্যাদি দেখার
চেষ্টা করেছেন। এবং সেখান থেকে তিনি পথ সন্ধানের চেষ্টা করেছেন--- এদের শুধু উন্মেচনই করেননি। সেখান থেকে তিনি একটা পথের
দিশাও দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ইতিহাস থেকে, বিভিন্ন সংগ্রাম বিভিন্ন বিপ্লব, বিদ্রোহ এগুলো তুলে এনেছেন এরং সেগুলো
ার ওপর তার নাটক তৈরি করেছেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে। যাতে সমসময়ের মানুষরা সমসাময়িক রাজনীতির প্রেক্ষিতে উদ্বুদ্ধ
হয়। এবং সেই বিশেষ অবস্থার পরিবর্তনে সে একটা ভূমিকা নেয়। কিংবা মতামত গ্রহণ করে, কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌছায়। তার মানে
উৎপলদার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্যেই নাটক করা. আবার আমরা যারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নাটক
করেছি কিংবা রাজনৈতিক নাটক করেছি যেখানে প্রত্যক্ষভাবে হয়তো রাজনীতির কথা হয়ত বলা হয়নি, মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষের
জীবনের সঙ্গে যেরকম বলা হয় যে রাজনীতি কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি সমাজকে প্রভাবিত করে। সমাজও
রাজনীতি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। উভয়ের মধ্যে এই দেওয়ার নেওয়াটা চলতেই থাকে। একটা দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তৈরি হয়। সেখানে
দাঁড়িয়ে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে কোন সামাজিক সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক এগুলো নিয়ে নাটক যখন আমরা করেছি
কিংবা করি তার মধ্যেও কিন্তু রাজনীতি এসে যায় কিংবা রাজনৈতিক থিয়েটার বলা যেতে পারে তাকে। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিই 'পুতুল
খেলা'। ইবসেন পুতুল খেলা লিখেছিলেন এবং তখনকার নৈরজিয়ান কিংবা ইওরোপিয়ান সমাজে তিনি যেভাবে নর নারীর সম্পর্ক
দেখতে পেয়েছিলেন, সেটা কিন্তু তখনকার যে সামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক কাঠামো তারই প্রতিচ্ছবি। ঐ স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে
আমরা খুঁজে পাই, তারা সেই সময়ের সেই ব্যবস্থার প্রোডাক্ট। সুতরাং তাদের সম্পর্কের ব্যক্তিগত সম্পর্কেও তার ছায়াপাত ঘটেছে।
সেই সময়কার রাজনীতির কিংবা অর্থনীতির ছায়াপাত ঘটেছে। আমি যদি শেক্সপিয়ারের নাটক দেখি, আরোও আগে যাই তাহলে
শেক্সপিয়ারের নাটকে তো রাজ্য রাজতন্ত্র রাষ্ট্র তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, সংঘাত এও বিপুলভাবে দেখতে পাবো। উৎপল দত্তর শেক্সপিয়
ারের সমাজচেতনা বইটাতে আমরা তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাই। ওটাকে অনেকে বাড়াবাড়ি বলতে পারেন যে, সব জিনিসকে ওইরকম
একটা আগে সিদ্ধান্ত খাড়া করে তারপর সেটার মত করে যুক্তি সাজানো হয়েছে। তৎসত্ত্বেও সাধারণ পাঠকের চোখেও ধরা পড়বে যে
শেক্সপিয়ার কতটাই রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন। রাষ্ট্র সম্পর্কে, মানুষের সম্পর্কে, পুষদেরসম্পর্কে, রাজতন্ত্র সম্পর্কে, সাধারণ মানুষ
সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে তার কী ভাবনা চিন্তা ছিল। সেগুলো কি আমরারাজনৈতিক নাটক বলব নাকি? নিশ্চয়ই বলব। আমাদের ন
াটকে আমরা ঐ ধরনের কখনও প্রচারকের ভূমিকা নিইনি। আমরা সময়টাকে সমাজটাকে আমি যেভাবে দেখেছি তার যে দ্বন্দ্ব, সংঘাত
যে কোন স্তরেই হোক একেবারেইরাজনৈতিক স্তরেও হতে পারে, সামাজিক স্তরেও হতে পারে। পারিবারিক স্তরেও হতে পারে। ব্যক্তি ম
ানুষের দ্বন্দ্বের মধ্যে হতে পারে। ব্যক্তিগত স্তরেও হতে পারে। সেখানে কিন্তু সেই সময়কার রাজনীতি, তার ছায়াপাত ঘটবেই ঘটবে।
এবং সেইভাবে যদি নাটকগুলো ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এই নাটকগুলো বেশিরভাগ সময়ই সেই অর্থে র
াজনৈতিক পটে করা। আমি তোমার লেখা 'অদ্ভুত আঁধার'-এর কথা বলব। সেখানে অনেকে অভিযোগ কিংবা অনুযোগের সুরে
বলেছেন। আমাদের বেশ ভাল লাগছিল যে কমিউনিস্ট পার্টির মদ্যে এই সময় দাঁড়িয়ে কুনীতির আর সুনীতির কিংবা কুমতির আর
সুমতির লড়াই চলছে সেটা বেশ সুন্দরভাবে এসেছিল। কিন্তু তার মধ্যে ঐ ছেলেটির সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্ক এবং তাদের সম্পর্কের
মধ্যে তৃতীয় পুষ গেল আর এক বন্ধু। তৃতীয় পুষের ঢুকে যাওয়া কিংবা তার যে শারীরিক অক্ষমতা, সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে তার
অক্ষমতা এইগুলো ঢুকে পরে নাটকটাকে কীরকম যেন করে তুলেছে। আমি আবার মনে করি নাটকটাকে সমৃদ্ধ করেছে। কারণ আম
াদের জীবনটা এরকমই। আজকে আমাদের জীবন ধারনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, ছেলেমেয়েকে পড়ানোর ক্ষেত্রে এডমিশনের ক্ষেত্রে, ছেলে
মেয়েকে মানুষ করার ক্ষেত্রে, আবার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে। আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছিকি কারণে? আমার স্ত্রী চাকরি করেন। অ
ামার পরিবারে এখন মূল আয় আমার স্ত্রীর মাধ্যমেই। তিনি সরকারী অফিসে চাকরি করেন। তা এর মধ্যে আমরা কি রাজনৈতিক চেহ

ারাগুলো পাবে না? আমার জীবনের মধ্যে এই জীবন নিয়ে যদি নাটক হয়, আমার মত একটা লোকের জীবন নিয়ে। এই ইন্ট ারভিউতেই আমি আমার সম্বন্ধে যা বললাম, চাকরি ছাড়ার ঘটনা বললাম। তারপর আমার স্ত্রী কীভাবে এই সংসারের হাল ধরল। অ ামার মেয়ে কীভাবে লেখাপড়া করেছে, কিংবা আগে যখন আমি আমার কথা বলেছি যে কোন স্কুলে দুবছরের বেশি পড়তে পারিনি। সিলেটে পড়েছি এক বছর, রাণাঘাট স্কুলে পড়েছি দু'বছর, তারপর ক'লকাতায় টাউন স্কুলে পড়েছি একবছর কেন? তাহলে আমার জীবনের ঘটনাগুলো নিয়ে নাটক হয়, তাহলে কি সেটা রাজনীতি নয়? রাজনীতির কারনেই কি এই ঘটনাগুলো ঘটেনি আমার জীবনে, নিশ্চই ঘটেছে। আমি ভিয়েৎনাম নাটক লিখেছিলাম ৬৭ সালে। তখন ভিয়েৎনাম নিয়ে নাটক-টাটক লেখা হচ্ছে চারপাশে। খুব সংগ্র ামী, চেতনা সম্পন্ন শ্লোগানধর্মী নাটক লেখা হচ্ছে। উৎপলদার অজেয় ভিয়েৎনাম দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন ঐ সময় আমরা নিউ এমপ্যায়ারে চার্বাক বোধহয় নাকি রূপান্তরীন তখন বোধহয় রূপান্তরী ছিল, জোসনদার নাটক দেখতে যাই 'অমর ভিয়েৎনাম'। তা ওটা দেখে বেরিয়ে এসে এসপ্ল্যানেডের বাস গুমটিতে দাঁড়িয়ে আলোচনা করছিলাম, রবুদা, রবিন চক্রবর্তী তখন নান্দীকারে ছিলেন। অ ামরা তখন নান্দীকার থেকে বেরিয়ে এসেছি- আমি, মোহিতবাবু, সত্যেনবাবু। আমি বলছিলাম যে উৎপলদার এই দ্বিতীয় শ্রেণী তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ দেখতে ভাল লাগে না। নতুন রকমভাবে বলা উচিত। তখন রবুদা বলেছিলেন, বিভাস বলা সহজ কিন্তু করা সহজ নয়। তখন আমি প্রায় চ্যালেঞ্জ নিয়ে একটা নাটক লিখেছিলাম, ভিয়েৎনাম। কাঠামোটা নিয়েছিলাম 'ক্যাম্পবেল অব কিলমের' বলে একটা একাঙ্ক ইংরাজী নাটক আমাদের পাঠ্য ছিল ইন্টারমিডিয়েটে, সেখান থেকে। সেটা একেবারে নতুন ধরনের নাটক সেখানে কোন ওই ধরনের ভঙ্গিমাই ছিল না। অর্থাৎ সেখানে উচচকিত কিছু ছিলনা স্লোগান ছিল না, সেখানে ওখানকার যে সংগ্রামী মানুষ ভিয়েৎনামে, ত ারা তাদের জীবনচর্চা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ পারিবারিক বন্ধন, আত্মীয়তা এগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে আর ভেতরে রয়েছে সংগ্রামী শপথ, উত্তেজনা, শক্তি । বাইরে তার প্রকাশ নেই। শ্লোগান দেয় না। তাদের কাব্য প্রেম, তাদের জীবন চর্চা, সম্পর্কগুলো - মার সঙ্গে ছেলের, সঙ্গে প্রেমিকার, প্রেমিকার সঙ্গে মায়ের সেগুলো খুব সুন্দর এবং রোমান্টিক ও বলা চলে। সেখানে হো -চি-মিনের প্রোটোটাইপ হিসেবে একটা চরিত্রকে এসেছিলাম সে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, সে সাধারণ ভাবে কথা বলে, সে কবিতা লেখার আমাদের হো-চি-মিনও কবিতা লিখতেন। সে কবিতা লেখা তার সঙ্গে তার বন্ধুর স্ত্রী কথা বলছে--- পুরনো স্মৃতিগুলো -এ সঙ্গে লড়াই করেছে, তিনি অ াজ নেই, তিনি মারা গেছেন। সংগ্রামেই বলি হয়েছেন। কিন্তু একেবারে স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধতার মধ্যে দিয়েও যে রাজনৈতিক কথা বলা যায় এবং সেটা যে মানুষের অন্তরে কত গভীরভাবে প্রবেশ করে, নাড়া দেয় সেটার পরিচয় পেয়েছিলাম 'ভিয়েতনাম' নাটকটা করে। আমি পরিচ ালনা করিনি। পরিচালনা অন্যরা করেছিল। সেটা এত জনপ্রিয় হয়েছিল, বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় হয়েছিল। আমরা করেছি, অন্যরাও করেছে। এবং দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটা দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন---তখন পরিচয় -এর তিনি সম্পাদক, উনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি নাটকটা 'পরিচয়'-এ ছেপে বের করতে চাই। আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। 'পরিচয়'-এ লেখা বেরনো মানে তখন একটা বিরাট ব্যাপার। তা আমার কাছে আবার 'চাক ভাঙ্গা মধু'-র কথা যেটা বললাম, 'চাক ভাঙ্গা মধু'-র রাজনীতি কি -- ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর, সে তার নীতির জায়গায় দাঁড়িয়ে সাপেকাটা জোতদার, যে তাদের জমি কেড়ে নিয়েছে, দিনমজুর বানিয়েছে-- সেই জোতদার মানুষটাকে বাঁচাবে কি বাঁচাবে না--- এই দ্বন্দ্ব। সেখানে তো সেটা ভীষণভাবে রাজনৈতিক নাটক আবার মানবিক নাটক। প্রফেসার ম্যামলক ঐ ইহুদি নিধনের মধ্যে দাঁড়িয়ে, ইহুদি ডাক্তার সে যে নাৎসি নেতাকে হসপিটালে নিয়ে আসা হয়েছে তার অপারেশন করবে কি করবে না। নিশ্চয় করবে, তার পেশা, তার জীবিকা তার মানবিকতা --- লড়াইটা তো অন্য জায়গায়। সেখানে আমি লড়ব, সেখানে আমি শোষিতদের একজন। তা এগুলোও তো রাজনীতি, রাজনৈতিক, নাটক। সুতরাং রাজনৈতিক নাটক নানা রকমের হতে প ারে। আমার মনে হয় যে আমরা বাঙালিরা, শিক্ষিত বাঙালিরা বড় বেশি রক্ষণশীল। একটা স্থির ধারণা আমাদের থাকে। ফিক্সড অ াইডিয়া যে একটা এই ওটা ওই। এখন থেকে ওটা খসলে এটা হল না। সবকিছুকে ফর্মুলায় ফেলার একটা ধরন।

স্যাস্ - এখানে, এই রক্ষণশীলতার জায়গাটায় আপনার কি মনেহয় এই যে একটা অদ্ভুত সুসংস্কৃত, সালংকার মধ্যবিত্ত কালচার নির্মিত হয়েছে, এর পিছনে রবীন্দ্রনাথ-- রবীন্দ্রনাথ না বলে বলা উচিত রবীন্দ্রনাথকে ভুল ভাবে রিড করা সেটা কি অনেকটা দায়ি নয়? আরো নির্দিষ্ট করে বললে, ধন আমাদের থিয়েটারের ক্ষেত্রে যদি আমরা অনেক বেশি আদর্শ করতাম মাইকেল, পার্টিকুলারলি 'বুড়ো শা লিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' তাহলে কিআমরা আরো অনেক বেশি--- আপনি যে থিয়েটারের কথা বলেছেন, থিয়েটারের যে ভাষার কথা বলছেন, অসংস্কৃত ভাষা, যেটা ফোক-রাল বা আরবান যাই বলুন, করতে পারতাম না যদি আমরা 'হুতোম পেঁচার' বা 'সধবার একাদশী' বা 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এই ট্রাডিশনকে আদর্শ করতাম, ধারাবাহিকতা দিতাম--- ভাষার জায়গ ায়,পড়ানোর জায়গায়?

বিভাস - তার আগে একটু বলেনি, আমি আগে যে প্রসঙ্গটি বলছিলাম, রাজনৈতিক থিয়েটার। এই যে রাজনৈতিক থিয়েটার-এর জন্ম কি শুধু গণনাট্য আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে? ফ্যাসিবাদের বিদ্ধে নাট্যকাররা স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিষয় করে নাটক লিখেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়--- সেগুলো কি রাজনৈতিক থিয়েটার নয়। মন্মথ রায়ের 'কারাগার' রাজনৈতিক থিয়েটার নয়? ব্রিটিশরা

নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন 'কারাগার'কে। সুতরাং আমরা ভুলে যাই আমাদের ইতিহাস, আমাদের ধারাবাহিকতা। আমরা ভাবি আমার সময়ে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেখান থেকে বোধহয় ইতিহাস শু। এটা আমি দেখেছি থিয়েটারের ব্যাপারে ভীষণভাবে, কারণ থিয়েটারকে তো হাতের কাছে পাওয়া যায় না। গিরিশবাবুর থিয়েটারকে হাতের কাছে পাই না, যদিও নাটকগুলো পাই। লেখা নাটকগুলো পাই। সেই জন্যে আমরা ভাবি বুঝি, উৎপল দত্ত থেকে শু হল। কিন্তু উৎপল দত্ত তা মনে করতেন না। উৎপল দত্ত মনে করতেন গিরিশ ঘোষের নাটকেও সেটা আছে। এই জন্যেই বলি রক্ষণশীলতা। এনিওয়ে। এবারযে প্রটা করলে---রবীন্দ্রনাথের যে চি, যে ভাষা এবং ভাষা ব্যবহারে তাঁর পছন্দ - অপছন্দ কিংবা তাঁর বাক্য গঠনের যে বিন্যাস এগুলো আমাদের কাছে আপাতভাবে একটু দূরত্বের সৃষ্টি করে মনে হয়। কিন্তু আমরা এগুলোর আবরণ, মানে নাটকের কাজ হচ্ছে লিখিত যে টেক্সট তার থেকে বেশি করে অলিখিত যেটা সেটাকে বের করে আনা। মঞ্চে সেটা জীবন পায়। লেখাতে যেটা ধরা যায় না, নাটকের একজন পরিচালকের কাজ হচ্ছে, নাট্যস্রষ্টার কাজ হচ্ছে সেটাকে তুলে আনা। আজকে ধর ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র প্রায়শ্চিত্ত - তে ছিল তিনি আবার 'মুক্তধারা'য় নিয়ে এসেছেন। ধনঞ্জয় বৈরাগী যখন গায় 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব ' কিংবা যে সব কথা বলেন, 'মারকে না মার দিয়ে জয় করতে পারিস না', 'শরীরে শক্তিটাকে যদি সবচেয়ে বড় শক্তি মনে করিস তাহলে মাংসটাকেই তো বড় মনে করিস। মাংসটাই কী সবচেয়ে বড় নাকি ! তাছাড়াও শরীরের ভেতরে যে রয়েছে মনটা, সেটাই কি আসল শক্তি নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক কথা বলে গানও গায়। আমার চিরকাল দেখেছি যে নাট্যে কিভাবে এসেছে, নাট্যে এসেছে খুব পেলব, খুব কাব্য, খুব কবি কবি ভাব করে সে গান গেয়ে গেয়ে কথা বলে, মিঠে মিঠে কথা, বলে সুরে সুরে কথা, বলে যখন তখন মনে হয় ন্যাকা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দোষ নয়, রবীন্দ্রনাথ তাকে লৌকিক চরিত্র এঁকেছেন, লোককবিকে এঁকেছেন। লোককবিরা খুব সবল হয়। খুব স্পষ্টবাদী হয়। বড় করে নিজের কথা বলতে পারেন। তার দর্শনের কথা বলতে পারে, আমরা যত লোককবি দেখি হাসান রাজাই হোন বা আমাদের লালনই হোন তারা কিন্তু এইভাবে কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা তাদের ইম্যাসকিউউলেট বলে না--- সেটা করেছি, করে থাকি আর কি. রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলোকে বিশেষ করে। এবং আমি তো মনে করি ধনঞ্জয় বৈরাগী অত্যন্ত শক্তির জায়গা থেকে কথাগুলো বলে। ওটা একটা ফিলজফি। ওটা তার লড়াইয়ের কৌশল। প্রবল শক্তিশালীর সাথে লড়াইয়ের কৌশল। এবং তার জয় সম্পর্কে, সে সুনিশ্চিত। আমি যদি কখনও করি 'মুক্তধারা' হয়তো করব, জানিনা। আমি কিন্তু দেখাব একজন শক্তসমর্থ লোক এবং শক্তসমর্থ উচচারণে কথাগুলো বলছে। হয়তো রবীন্দ্রনাথের সুর এসে (বলে, 'আামি মারের সাগর পাড়ি দেব' গানটা প্রচলিত সুরে গেয়ে তারপর যেভাবে বিভাসদা গাইলেন সেটার মধ্যে দৃপ্ততা এবং দৃঢ়তা প্রকাশ পেল) এটা উদ্দীপক হয়ে যায়। এটা কথার কথা, আমার মতো করে বলছি আরকি। এবং ঐ চরিত্রটাকে যদি ওরকম দেখতে হয়, তাহলে কিন্তু অন্যরকম ভাবনা হয় চরিত্রটা সম্পর্কে। এবং আমরা চৈতন্যকে -- কী করে চালু হল কথাটা জানি না, ন্যাকা - চৈতন বলি। চৈতন্য, ফ্যারদেস্ট ফর্ম ন্যাকামি। চৈতন্য ছিলেন বিপ্লবী। এক্কেবারে উল্টো, চৈতন্যর মতো লোক যদি থাকত আমাদের দেশে---অনেকে বলে চৈতন্য আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের একজন। মানে হতে পারতেন। তাঁর পথ ধরে যদি আমরা--- তাঁর দর্শনটাকে উপলব্ধি করতে পারতাম। তাঁর জীবনটাকে যদি--এই যে জীবনটাকে বোঝা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই ভুল করে থাকি আমরা। আমরা যদি তাঁর একেবপর এক নাটকগুলো দেখি, তাহলে দেখব যে কিভাবে একদিকে আধুনিক চিন্তাধারা আবার অন্যদিকে তিনি দেশজ নাটকের রূপ নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। খোলামেলা, আমাদের জীবনটাই--- আমাদের বেশিরভাগ মানুষই জীবনযাপন করে খোলা আকাশের নিচে। তাদের কেনাবেচা, তাদের মেলামেশা, আনন্দ ফুর্তি, তাদের নৌকো বাওয়া, তাদের খেতে কাজ করা, তাদের গানবাজনা, সমস্ত কিছুই কিন্তু খোলা আকাশের নিচে। রবীন্দ্রনাথ এই খোলা মেজাজ নিয়ে এসেছিলেন নাটকে। সেখানে তিনি ওই লোকনাট্য রীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন একদিকে এবং তার সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারামিশিয়েছেন। আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

১৯২০ সালে আমেরিকা গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দেখেছেন সেখানে পুঁজিবাদের উত্থান কী অবস্থাপ্রাপ্ত হয়েছে। যন্ত্রমানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে। মানুষ যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে না। মানুষ যখন যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন ধবংস অবশ্যম্ভাবী। সেই কথাগুলো কি সুন্দরভাবে তাঁর 'মুক্তধারা' কিংবা 'রক্তকরবী' নাটকে এসেছে। তার মতো রাজনৈতিকনাটককার কজন আছে? যদি 'রথের রশির কথা ভাবি'-- ক'জন আছেন? এখন এগুলোর উপরিস্তরে তাঁর যে ভাষা তার যে চি, সেটা কিন্তু থাকতেই পারে, সবাই কি দীনবন্ধুর ভাষায় লিখবে, সবাই কি মাইকেলের ভাষায় লিখবে,মাইকেল যখন 'মেঘনাদবদ কাব্য' লেখেন তখন এক ভাষায় লেখেন আর যখন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' লেখেন আর এক ভাষায় লেখেন। এ তফাৎ থাকবেই মানুষে হতে পারে। বিষয়ে বিষয়ে হতে পারে এবং সেটা কোনো বিচার্য বিষয়ই নয় বলে আমি মনে করি। আমি কোনটা নেব, কীভাবে নেব, সেটা হচ্ছে আসল কথা। আমি যদি রবীন্দ্রনাথের উপরিস্তরের এই চি তথাকথিত চি যা আমার জীবন চর্চা নিয়ন্ত্রিত করে বাচনে - চলনে, বলনে..... সেই আপাত কৃত্রিমতার ভাব, রবীন্দ্রনাথের কৃত্রিমতা না, রবীন্দ্রনাথ হল স্টাইল। শম্ভু মিত্রকে যখন কেউ অনুকরণ করে অভিনয় করে তখন কৃত্রিম লাগে। তার কণ্ঠস্বর যখন অনুকরণ করে। কই শম্ভু মিত্র যখন করে তখন তো লাগে না, কারণ ওটা তার নিজস্ব স্টাইল। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের ওটা স্টাইল। সবার স্টাইল এক হবে কেন? দীনবন্ধু, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ কেন এক হবেন? এটাই তো বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্যই তো আমরা চাই শিল্পে। ওটা ভুল। সেই জন্যে

আমি শুতে বলেছিলাম তখন আমাদের যৌবন--- আমরা দেখতাম সুন্দর করে কথা বলা-- আমরা বলতাম এরাখুব রাবীন্দ্রিক, মহিলারা রবীন্দ্র সংগীত গাইতেন এবং খুব সুন্দর করে কথা বলতেন। আমরা দেখতাম হস্তাক্ষর রবীন্দ্রনাথের মত করার প্রচেষ্টা, এগুলো ওই শিক্ষিত লোকেরা করেন। তারা অনুকরণ করেন বাইরেটার, ভেতরে ঢুকতে চান না। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়, যে বাইরেটা ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে হয়। এটা হচ্ছে আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে।

স্যাস্ - কন্টেন্ট -এর জায়গায় তো রবীন্দ্রনাথ বারবার অচল আয়তনকে ভেঙেছেন। সে জায়গাটা থেকে আমি বলছি না। আমি বলছি ভাষাটা যে জায়গায় নিয়ে গেছেন। আমি আরো নির্দিষ্ট করে বলছি, ধন আপনি করেছেন 'চাকাভাঙা মধু'। 'চাকাভাঙা মধু'তে জটা, আমার যতদূর মনে পড়ছে স্মৃতি থেকে বলছি। একটা জায়গায় ছিল 'বাঁশ কেন ঝাড়ে এসো আমার গর্তে' আপনি বলেন। প্রবাদটা কিন্তু ঠিক এরকম নয়। আমরা ওই গর্তে এসে আটকে যাচ্ছি। আমরা রক্ষণশীল। আমি বলছি এই আটকে যাওয়াটা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে আজকে কিন্তু এই ব্যাপারটা ভীষণভাবে ঘটছে। আজকে আমরা যখন লিখতে যাচ্ছি। মঞ্চে গিয়ে বলতে যাচ্ছি, তখন আমরা ভীষণ রক্ষণশীল হয়ে পড়ছি ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে। এইটার জায়গায় আমি বলছি যে সেখানে যদি হুতোম বা মাইকেল বা, দীনবন্ধু যে ভাষাটা --- আমি থিয়েটারে বলছি, আমি মাইকেল 'মেঘনাদ বধ'-এ ভাষাটা ব্যবহার করেছে সেটা বলছি না, 'বুড়ো সালিকে'... যেটা ব্যবহার করেছেন সেই ট্রাডিশনটা ধন, আজ থেকে ১৪০ বছর আগে, সেটাকে যদি আমরা টানতামআজকে বোধহয় আমার মনে হয়, যেটা আপনি বলতে পারবেন, যে ধন আজকে দারিও ফো-তে যদি যাই আমি,
সেই যাওয়াটা খুব ধারাবাহিকভাবে, স্বচ্ছন্দের সঙ্গে, অনায়াসে পৌঁছোতাম না কি ?

বিভাস - একদম ঠিক কথা বলেছ। কিছুদিন আগে বোধহয় অনুষ্টুপ -এ সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা লেখা পড়েছিলাম এই অশ্লীলতা সম্পর্কে। এবং সেখানে ঠিক ওই কথাই বলেছে। আমাদের সাহিত্য কত খোলমোলা ছিল, কত স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, কতপ্রাণ ছিল তাতে। মানুষের মনের কথা খোলাখুলি সুন্দরভাবে বলা যেত শিল্প সম্মতভাবে বলা যেত। কিন্তু ইংরেজদের ভিক্টরিয়ান যে মরালিটি সেইটে আসার পরে আমরা যে কীরকম নিজেদের মধ্যেশ্লীলতার বোধটা কী রকম বাড়িয়ে দিলাম। এবং সব কিছুতে না , এটা বলা চলে না, ওটা বলা চলে না, এই বলা চলে না ইত্যাদি।এখানেও আমরা দেখব যে রক্ষণশীলতা কীভাবে কাজ করে। এখানে একটা আধুনিক ছেলে যখন বলে বেশ্যা। আমাদের বাঙালি ভদ্রলোকেরা বলতে পারে না, প্রস্টিটিউট বলে। বেশ্যা বলতে পারে না। আমরা যেরকম অনবরত শুনিশিট, শিট, কিন্তু হাগা বললেনই কী রকম একটা এমা ---ইস বাবা! তোমার মুখটা গুয়ের মত দেখতে বললেই তখনকিন্তু অশ্লীল হয়ে যাবে। যেরকম আমরা অ্যাসহোল ওটা ইংরেজিতে খুব চলে কিংবা আই বাগ্যার ইউ এটা আমরা বলাতে পারি, লেখাপড়া জানা লোকেরা কিন্তু 'আমি তোমার পেছন মেরে দেবো' এটা কেউ বলতে পারবে না।
স্যাস্ - না ঠিক তা বলছি না, পারি না মানে---

বিভাস - পারি না বলতে কি মানে কোনো নাটকে পারি না। কিন্তু নাটকে যদি আবার ওটাই বলার জন্যে বলার মতো করে আসে তাহলে ওটা অশ্লীলতাই হয়। এই যে-- বাঁশ তুমি ঝাড়ে কেন এসো মোর গর্তে এটাতে যা বলার তা বলা হল, আবার প্রচলিত যে প্রবচন গ্রাম্য সে বলার ধরন সেটাকেও রাখা হল তাতে কোন অসুবিধে হল না। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় মাগী শব্দ যখন দেখি তখন কিছু মনে করি না। এখন কিন্তু 'মাগীটা' দেখতে কেমন দেখছিস, মাগী বললে ভাবব ওটা একটা গালাগাল হল। সুতরাং সময় সময় পাল্টায়ও। আর কতগুলো ধর, --- আমরা মদ খাচ্ছি বলি না। ড্রিংক করছি কিংবা খুব একটা শিক্ষিত কালচারড্ বাঙালি হলে বলেন মদ্যপান করলাম আজকে। কিন্তু মদ খাচ্ছি বললেই মনে হয় খুব একটা খারাপ কাজ করছি। তো এরকম কিছু বাঙালি মধ্যবিত্তের ভনিতা, চিবোধ এগুলো অসামঞ্জস্যপূর্ণ সব ব্যাপার। এমনকি নিজের স্ত্রীকে স্ত্রী বলেন না বউ বলে না বলে ওয়াইফ, কিংবা আমার মিসেস। এগুলো, ইংরেজদের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে না আমাদের অনেক কিছু গুলিয়ে গেছে। ইংরেজদের সংস্পর্শে আসারফলে ওদের যে কতগুলো চি আছে, সেই চিটাকে কিছুটা নেওয়ার চেষ্টা, প্লাস আমাদের একটা সাবেকি কতকগুলো রক্ষণশীলতা, সেটা নিয়ে সব গুলিয়ে - মুলিয়ে একটা অদ্ভুত কালচারের সৃষ্টি হয়েছে, এবং এটারস্রষ্টা হচ্ছে বাঙালি শিক্ষত মধ্যবিত্তরা। কারণ তারাই তো শিল্প করেন, তারাই তো রাজনীতি করেন, তারাই তো সব করেন।

স্যাস্ - হ্যাঁ, ইংরেজরা কিন্তু ওটা কাটিয়ে উঠেছে। ওদের এই সময়ের এক নাটককার, Alan Benntt,তাঁর একটা
নাটকের নাম কাফকা'স ডিক, হ্যাঁ তো নাটকটা কাফকার ডিক নিয়ে। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা ভাবতেই পারি না। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে শুধু ইংরেজ বলে না, ইংরেজ প্রভাব তো। রামমোহন রায় থেকে শু হয়েছে।
বিভাস ভিক্টোরিয়ান যুগ থেকে বল।

স্যাস্ হ্যাঁ, আমি বলছি এটা কি আমাদের অনেক বেশি রক্ষণশীল করে দেয়নি ? যার ফলে আমরা কিন্তু থিয়েটারেও অনেক বৈচিত্র্য হারাচ্ছি। এমন অনেক বিষয়ে আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি না রক্ষণশীলতার জায়গা থেকে। আমি বলছি যৌনতার জায়গাতেও আমরা যাচ্ছি না। আমাদের নাটক দেখে যে কোনও সুস্থ লোক বলতে পারে--- এদের কিইয়ে নেই ?

বিভাস - হ্যাঁ, থিয়েটারে রক্ষণশীল তো আমরা বটেই। খালি যৌনতার দিক থেকে নয়, খালি ভাষার ব্যবহারে নয়, বিষয়ের দিক থেকে নয়, কিরকম বলব-- মানে বলতে খুব সংকোচ হচ্ছে, আমি 'বিসর্জন' নামে একটা নাটক করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের নাটক 'বিসর্জন' তার থেকে নিয়ে, আর করেছিলাম ওনারই 'স্যাকরিফাইস' বিসর্জনের অনুবাদ ছিল সেটার এডিটেড ভার্সন এত সুন্দর সেটার এডিটিং। সেটা থেকে নিয়েছিলাম আর 'রাজর্ষি' উপন্যাস থেকে নিয়েছিলাম। এখন যেহেতু 'রাজর্ষি' উপন্যাস থেকে নিয়েছি, ওটা তো আমি কাব্যের সাথে জুড়ে দিলে সেই একটা কুৎসিত ব্যাপার হবে। চলতে পারে না, সেইজন্যে আমি করেছিলাম পুরোটাই গদ্যে এবং গদ্যে করলে আমার মনে হয়েছিল, যে 'বিসর্জন' এতদিন পর্যন্ত লোকের---নাটকটা পড়তে খুব ভাল লাগে কিন্তু করতে গিয়ে দেখা যায় সেরকম জমে না। আমার মনে হয়েছিল সেরকম কাব্য এসে নাটকীয়তাকে আচ্ছন্ন করে বলে মনে হয়েছিল। সেই জন্যে আমি কাব্যাংশ গদ্য করেছিলাম আর 'রাজর্ষি'র গদ্যাংশ তো গদ্যাংশই করেছিলাম। বেশিরভাগ থিয়েটারের মানুষ এবং আশপাশের পণ্ডিত লোকজন প্রায় ছি ছিক্কার করে উঠলেন। যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ধ্যাষ্টামো। বিশ্বভারতী বোর্ড কিন্তু পারমিশন দিয়েছিল, সেটা একটা বিরাট ব্যাপার। কিন্তু এমনি মানুষরাই ধিক্কার দিয়ে উঠলেন। এবং পরবর্তী কিছুদিনের মধ্যেই একটি দল 'বিসর্জন' নাটকটা করল। সেখানে বিজ্ঞাপন দিল, 'বিসর্জন' কোনো পরীক্ষা -নিরীক্ষা নয়। মানে পরীক্ষা - নিরীক্ষা করেছি আমরার সেটার প্রতি কটুক্তি করে আরকি, মানে সেটার প্রতি কটাক্ষ করে তারা লিখলেন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা নয়। এটা একেবারে খাঁটি আগ মার্ক 'বিসর্জন'। আগমার্কা রবীন্দ্রনাথ। তা এই যে বিদেশে প্রচুর এটা ...একটা ট্রাডিশনে দাঁড়িয়ে গেছে যে পুরনো ক্লাসিক নাটককে ভেঙেচুরে নতুন করে আবার একটা টেক্সট তৈরি করা তার থেকে। টেক্সট তৈরি করে সেটা করা। শেকস্পিয়রকে নিয়ে আকচার হয়েছে ছবিতে হয়েছে, নাটকে হয়েছে, প্রোডাকশনে হয়েছে।

প্রঃ এই তো বিসিএল -এ করে গেলেন Steven Brakof, বিখ্যাত ব্রিটিশ নাটককার, অভিনেতা , শেকসপিয়ারের নাটক নিয়ে চরিত্র নিয়ে --- অসাধারণ। আমাদের ব্রিটিকদের ভাষায় অবশ্য ধ্যাষ্টামো শেকসপিয়ার নিয়ে।

বিভাস - এমনকি উৎপল দত্তর মতো লোক বললেন যে নাটকটা যদি গদ্যেই হবে তাহলে তো রবীন্দ্রনাথ গদ্যেই লিখতেন। আর একজন বললেন, তিনি লিখলেন -- আসলে এখানকার ছেলেমেয়েরা তো কাব্যে সংলাপ বলতে পারে না সেইজন্যে ওটা গদ্য করে নেওয়া হয়েছে। তিনি একজন রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ নাটকের মানুষ। অর্থাৎ এই প্রচেষ্টাকে কীরকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল রক্ষণশীলতার জন্যে। আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল উৎপল দত্তকে, আপনি যে শেকসপিয়ার করেন ওগুলোতে ব্রিটিশদের স্কুল - মডেল প্রোডাকশন। আপনি তো সেইগুলো করেন--- কারণ যেহেতু এখানকার লোক দেখেনি। আপনার মধ্যে তো পিটার ব্রুক যেরকম করেছেন শেকপিয়ার নিয়ে, সেরকম কিছু দেখা যায় না ! তো এইটা হচ্ছে কথা, রক্ষণশীল তো আমরা বটেই। সব বিষয়ে রক্ষণশীল, এই গেল গেল, এটা কেন ! এবং প্রত্যেকেই মনে করে সে যা ভাবচে সেরকম হচ্ছে না। কেন। তার ভাবনাটাই ঠিক। আমি যেটা ভাবছি সেটাই তো ঠিক, নাটকটা এদিকে যাওয়া উচিত, থিয়েটারটা এদিকে যাওয়া উচিত। সে কখনও ভাবেনা যে আমার থেকে আমার বাবা যেরকম বড়। আমার থেকে থিয়েটারও অনেক বড়, আরো বড়, আরো বড়। থিয়েটারটা আমার মতামতের অপেক্ষায় নেই পৃথিবীতে। থিয়েটারটা আমার মতামত নিরপেক্ষভাবেই কিন্তু অনেক বড় হয়েছে, অনেক এগিয়েছে, ফুলে ফুলে পল্লবিত হয়েছে, পৃথিবীর বিরাট প্রতিভাবান মানুষ এই থিয়েটার নিয়ে নানারকম কাজ করেছেন। আমাদের এখানে ওই সমাজের কিছু মানুষ, ওই চণ্ডীমণ্ডপে, থিয়েটারের চণ্ডীমণ্ডপে থেলো হুকো হাতে কিছু ওই অমুক, পণ্ডিত আছেন, টুলো পণ্ডিত, তারা থিয়েটার নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। থিয়েটারটা এই হওয়া উচিত ।এই থিয়েটারটা ঠিক নয়, ওই থিয়েটারটা ঠিক নয়। আরে থিয়েটারটা নিজের গতিতে ভালমন্দ নিয়ে চলবে। যাদের মানুষ গ্রহণ করবে না, তারা পথের পাশে পড়ে থাকবে। যাদের গ্রহণ করবে, তারা এগিয়ে যাবে থিয়েটারটাকে নিয়ে এই তো কথা। সুতরাং এই রক্ষণশীলতা আমাদের সমাজের অঙ্গে অঙ্গে প্রতিটি ব্যাপারে। রাজনীতিতে রক্ষণশীলতা মৌলবাদীতা, থিয়েটারে মৌলবাদীতা রক্ষণশীলতা, ভাষার ব্যাপারে রক্ষণশীলতা এটা তো আছেই। জীবনচর্চায় রক্ষণশীলতা, কিন্তু আটকাতে পারছি কিছু ? সমাজের শ্লীলায়ন আটকাতে পেরেছে, সমাজের দুর্বৃত্তায়ন আটকাতে পেরেছে যে সমস্ত রোগ চারপাশে দগদগে হয়ে ফুটে উঠছে সমাজের মধ্যে এতকিছু করে সেগুলো আটকাতে পেরেছে রক্ষণশীলতা ? সুতরাং এটা বড় ভয়ংকর রোগ।

প্রঃ এই যে সর্বব্যাপী রক্ষণশীলতা, যেটাকে একটা ভয়ংকর রোগ বলে মনে করেন আপনি, সেটাকে কীভাবে ভাঙছেন আপনার নাটকে

? 'মহাকালীর' বাচচা পর্যন্ত শুনেছি. তার পরবর্তী প্রযোজনা ?

বিভাস - মহাকালীর বাচচার কথা বলতে গিয়ে আমি হয়ত ১৯৭৬ এ 'নরক গুলজারের' কথা বলিনি। 'নরক গুলজারটা' আমার কাছে একটা ভীষণ ইমপ্যরট্যানট প্রোডাকশন এবং আবারও থিয়েটারের পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে থিয়েটারের ভাষার ক্ষেত্রে একটা দৃষ্টান্ত; মানে আমার কাছে একটা প্রধান ঘটনা। এই যে তোমার কাছে... এটা অবশ্য পরে প্রশ্নটা এসেছে। যে কথাগুলো 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা মাইকেলের, দীনবন্ধু মিত্রের কথা বল যে ভাষার ক্ষেত্রে তথাকথিত আরোপিত চি এবং কৃত্রিমতা এগুলোর বাইরে এসে অন্যরকম ভাবে কথা বলা, তো নরক গুলজারে তেমনি অনেকটাই একটা প্রহসন, এবং সেই প্রহসন খুব আপাত--- স্টাইলটাই হচ্ছে স্থুলতা অর্থাৎ তার পোশাকআশাক থেকে সেটা থেকে সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা ইচছাকৃত স্থুলতা নিয়ে আসা হয়েছে। তার এ্যাক্টিং স্ট াইলের মধ্যে, বাজে যাত্রার অ্যাক্টিংকে নকল করে অভিনয় করা। ফুটপাতের ক্যালেণ্ডারে যে দেবদেবীর মূর্তি থাকে সেই অনুযায়ী ত াদের মেক-আপ করা নারদ, ব্রহ্মা কিংবা যম এদেরকে সাজানা। সেটের মধ্যে পঞ্জিকাতে যে নানাবিধ স্বর্গ -নরকের দৃশ্যের ছবি আঁকা থাকে পেন্টিং, এইগুলো কিন্তু সমস্তটার মধ্যেই সেই ব্যাপারটা আনার চেষ্টা করেছি। তাতে জনসাধারণ ভীষণভাবে নিয়েছেন। কিন্তু অ াবার আমার রক্ষণশীল, চিশীল, সংস্কৃতিবান থিয়েটারের মানুষেরা এবং আশাপাশের পণ্ডিতরা সেটা স্থুল মনে করেছেন। এটা তাদের কাছে মনে হয়েছে। কিন্তু ওই স্টাইলে -এর আগে কিংবা পরে একটা নাটকও তো দেখলাম না। তা হলে 'নরকগুলজার' এতপ্রিয় হল কেন। শুধু আমার 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' প্রযোজনাই নয়। এই নাটকটা তাছাড়া বাইরের এত জায়গায় হয়েছে যে তার ইয়ত্ত্বা নেই। কিন্তু যে ওটা একটা বিশেষ স্টাইলে করা হল সেই স্টাইলটা নিয়ে কোনো আলোচনা নেই। যে লোকটা 'চাক ভাঙা মধু' করতে পারে, শোয়াইক করতে... (শোয়াইক অবশ্য পরবর্তী স্তরে) যে করতে পারে, সে কেন 'নরকগুলজার' করল এবং ওইভাবেই করল কেন। সেটা বোঝার ইচছা কার মধ্যে হল না। তারা ওটা রিজেক্ট করলেন। বড্ড মোটা দাগের। আরো অনেক সময় মোটা দাগটা ইচছাকৃত। ইচছ াকৃত মোটা দাগটাও বুঝতে পারল না। ওটা ডেলিবারেট, ওটাই স্টাইল করা হয়েছে। কাজেই সেট পোশাক - আশাক, অ্যাকটিং স্ট াইল, মিউজিক মিলিয়ে যদি দেখতে পারতেন,তাহলে বুঝতে পারতেন না--- এটা একটা অন্যরকম নাট্য অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার কাছে একটা অন্যতম প্রিয় কাজ নরক গুলজার। এবং এটা সাহসী রাজনৈতিক নাটকও বলব। ১৯৭১ সালে যখন নাটকটা করা হয় তখন মুখ খুলে কোনো কথা বলা যাচ্ছিল ন। সেই জন্যে, 'কেউ কথা বলো না, কেউ শব্দ করো না, ভগবান নিদ্রা গিয়েছেন গোলাযোগ সইতে পারেন না।' তখন দুটো নাটক ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে হয়েছিল। একটা হয়েছিল উৎপল দত্ত করেছিলেন... স্যাস্ - 'দুঃস্বপ্নের নগরী।'

বিভাস - না - না - না 'দুঃস্বপ্নের নগরী'না। উৎপলদা তো অনেকগুলো করেছেন। কিন্তু ১৯৭১সালে না --- না সরি ১৯৭৬ ঐ নাটকট া ঐ যে সত্যদা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতেন। এবং ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে তখন জরি অবস্থা চলছে, সেই জরি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ঐ রকম দেবদেবীর স্বর্গ - মর্ত - নরকের প্রহসন সৃষ্টি করে কিন্তু ইমার্জেন্সির বিদ্ধে প্রায় সরাসরি বক্তব্য রাখা হয়েছিল। এবং সেটার মধ্যে যে রাজনৈতিক এলিমেন্টগুলো ছিল এবং দুঃসাহসের পরিচয় ছিল সেটা নিয়েও কেউ বলল না। তা এরকম রক্ষণশীলতা আছে। আর আমার বিদ্ধে--- বিদ্ধে না বলে বলব আমার কাছে অভিযোগ আসে, সেদিনকে ঋতুপর্ণ বলতে চেয়েছিল... আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, এখন বুঝতে পারছি ও ঠিক কী বলতে চেয়েছিল। তখন আমি উত্তরটা ঠিক--ওর প্রশ্নটাও ভাল বুঝতে পারিনি, ও বোঝ াতেও পারেনি। ও বলতে চাইছিল হয়তো, আমি সে এই আমাদের রাল ফোক এবং আরবান ফোক নিয়ে এতদিন বিরাট একটা প্রেক্ষ াপটে কাজ করেছি, আবার আমি অনেকটা গুটিয়ে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে চলে এসেছি কেন। ও, বোধহয় বলতে চাইল যে এখনকার যে ধর 'অদ্ভুত আঁধার'। অদ্ভুত আঁধারে ঘরের মধ্যে ঘটনাটা ঘটাচ্ছ বলেই কি ঘরের মধ্যে। এই যে ফিজিক্যাল লেভেলে সবকিছু দেখা, যে ঘরের মধ্যে হচ্ছে কিন্তু ঘরের দেওয়াল কেটে বেরিয়ে পুরো বাইরেটা নিয়ে আসা হচ্ছে সেটা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করে না। এরং সবসময় কি মঞ্চের মধ্যে ধুমধাড়াক্কা -হৈ চৈ-মারদাঙ্গা-হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি করে 'মাধব মালঞ্চী' হবে একটা কিংবা 'মহাকালীর বাচচ া' হবে আরেকটা। তা হবে কেন, তিনজনের একটা নাটক করতে পারি দুজনের একটা নাটক করতে পারি। তার মধেও যথেষ্ট কথার মধ্যে এ্যাকশন থাকবে, যখন শেকস্পিয়রের হ্যামলেটের কথা ওঠে--তখন হ্যামলেটের যে সলিলকি তার মধ্যে অ্যাকশন নেই ? শব্দের মধ্যে অ্যাকশন আছে, কথা বলার মধ্যে অ্যাকশন আছে, আমরা সেই ছবিগুলো দেখতে পাই। এগুলো জানতে হয়, বুঝতে হয়। তো সেইটা অনেকের অভাব দেখি আমি। আমি 'অদ্ভুত আঁধারে' ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে পুরো ঘটনাটা রেখেছি কিন্তু আমার তো বাইরের কথাগুলোই এসেছে ওখানে সমস্তটাই তো বাইরের। এটা তো আবার নাটকের একটা পরীক্ষা। শম্ভু মিত্র'র নাটক যারা দেখেন, তাদের তো অন্তত ঐ শিক্ষাটা থাকা উচিত ভীষণভাবে। উৎপল দত্ত-র নাটকের সাথে শম্ভু মিত্র-র নাটকের তফাৎটা তো ঐখানেই। উৎপল দত্ত বিশাল বিশাল সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনাগুলো নিয়ে আসেন ঐ বিদ্রোহ, বিপ্লব মহাবিপ্লবগুলো নিয়ে আসেন। তার জন্যতার সেটও সেরকম হয়, মিউজিকেও সেরকম, এ্যাক্টিংটাও সেরকম হয়। আর শম্ভু মিত্র একটা ক্যারেকটারকে নীড়ধরে সেখানে তাদের মধ্যেকার যে

দ্বন্দ্ব সম্পর্ক, এইগুলো যখন তুলে ধরেন তখন কিন্তু আমরা বাইরেটা দেখতে পাই, সে 'রাজা'ই হোক, 'বাকি ইতিহাস'ই হোক বা 'চার অধ্যায়' হোক-- এগুলো দেখতে পাই। কিংবা 'দশচক্র'ই হোক, তা ওগুলো যদি মনে হয় যে এগুলো একটা লোকের চিন্তাভাবনার দৈন্য থেকে এগুলো হচ্ছে। তাহলে অত্যন্ত ভুল ধরা হবে। দারিও ফো-র এই নাটক---পাঁচটি ক্যারেকটার। একরকম দেখতে দুটি ঘর, একটা হয়তো তিনতলায়, একটা চারতলায় ঘর। পুলিশ কোয়ার্টারস দেখানো হচ্ছে। যে ঘটনাগুলো ওখানে ঘটছে তার ব্যাপ্তি তো ঐ ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সেখানে ঐ ১৯৭০-এর দশকের এরকম অসংখ্য ঘটনার মধ্যে চলে যাই আমি তাই না ? এবং সেটা দেখার চোখ থ াকা চাই, বোঝার চোখ থাকা চাই। এবং এক একটা নাটক এক এক রকম হবে, তার দাবি এক এক রকম থাকবে। এক একটা নাটকের বিষয়বস্তু, স্ট্রাকচার--- আমি থিয়েটারের বলছি না নাটকের স্ট্রাকচার বলছি, সেটা কী ফর্মে হবে সেটা নির্ধারণ করবে, নিরূপিত হবে ত ার স্টাইলটা কী ভাবে হবে। ধর জোছনাকুমারী 'জোছনাকুমারী' আমি আবার সেই, আমি আর্বান ফোক বলব। জোছনাকুমারী একটা মেয়েকে নিয়ে কিন্তু তার সঙ্গে এপাশের গ্রাম ওপাশের গ্রাম, এপাশের জীবন ও পাশের জীবন। আমাদের সংস্কার, আমাদের কুসংস্কার, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, আমাদের সীমান্ত ও সমস্তগুলো যুক্ত। তো সেখানে কী একটা ব্যাপ্তি 'জোছনাকুমারী' পায়না বিষয় হিসেবে কিংবা প্রযোজনার দিক থেকে। আসলে কী ঐ যে বললাম যে সমস্ত ব্যাপারটা কতকগুলো নিজেদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে কিংবা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার কতগুলো সীমাবদ্ধ সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠে এবং যেগুলোর সঙ্গে না মিললেই নতুন করে বোঝার -- যে সৃষ্টিটা চোখের সামনে দেখতে প াচ্ছি সেটাকে দেখার - বোঝার মানসিকতা সেটা আমাদের অনেকের নেই। আমি নিজেকে যেমন মনে করি অত্যন্ত একজন ভালো দর্শক, আমাকে যেটা দেখাতে চাইছে সেটাই আমি দেখি। সে অনুযায়ী আমি সেটাকে বিচার করি, সে কি দেখাতে চায়। আমি হলে কী করতাম, কিংবা আমার ইয়ের সঙ্গে মিলল না, সুতারং আমি রিজেক্ট করে দিলাম। আমি কখনও সেটা করি না। হ্যাঁ, তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমি এক মত নাও হতে পারি, সেটা আলাদা। কিন্তু থিয়েটার বলতে খালি এই, থিয়েটার বলতে খালি ওই, এটা কখনও হতে পারে না। অ ামার পরবর্তী স্তরে যে কাজগুলো করেছি 'বিসর্জন', কিংবা 'শোয়াইক গেল যুদ্ধে' থিয়েটার ওয়ার্কশপে তারপরে ওখানে 'মাধব ম ালঞ্চী' ছাড়া যেগুলোর রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ', 'জোছনাকুমারী', 'অদ্ভুত আঁধার' কিংবা 'মৃত্যু না হত্যা', কিংবা সর্বশেষ 'নাকছাবিটা' সেখানেও ওই কথা। তার মধ্যে যে দু-একটা কাজ করেছি মনোমত হয়নি। নাটকও মনোমত হয়নি। কিছুটা দলের প্রয়োজনে, দলের স াংগঠনিক চাপে করতে হয়েছে। যেরকম'আত্মগোপন' নাটকটা প্রথমার্ধে যেভাবে আমাকে উত্তেজিত করে শেষাংশ ঠিকভাবে... নাটকটার সঙ্গে ঠিকভাবে যায়নি বলে ওটা তেমন ভালভাবে করতে পারিনি কিংবা সর্বশেষ 'পেটচুরি' ওটা একটা জঘন্য কাজ। ওটা আসলে একটা প্রয়োজনে করেছিলাম কিন্তু তারপর দেখলাম এটা চলছে। সংগঠন চালাচ্ছে তাই চলছে। কিন্তু ওটা একটা---মানুষের কিছু কিছু কলঙ্ক থাকে, সেও, ওটা একটা কলঙ্কের ব্যাপার। কলঙ্ক আরো আছে। আমি প্রথমে বলেছিলাম আমার রাজনীতি কিংবা সমাজের ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে সবটাই খুব পজেটিভ সবটাই খুব সংগ্রামী-ফংগ্রামী এই শব্দগুলো আমি ব্যবহার করতে চাই না। কিন্তু আবার ইয়েও আছে আমি যখন দূরদর্শনের কাজ করি দূরদর্শন-কর্মী হিসাবে। একদিকে যেরকম জরি অবস্থায় 'নরকগুলজার' করছি সাহসের সঙ্গে, অন্যদিকে তেমনি জরি অবস্থার গুনগান করে আমাকে কিছু প্রোগ্রাম করতে হয়েছে। যেখানে আমার জীবিকা এবং আমার বিশ্বাসও আদর্শের একটি সংঘাত ঘটছে। আমাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে, সেটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। এটা জীবনে শুধু একবারই ঘটেছে।

স্যাস্ - ব্যক্তি হিসেবে প্রতিটি মানুষকেই বোধহয় এই রকম একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেখানে বিশ্বাসের সঙ্গে বেঁচে থাকার একটা কম্প্রোমাইস করতে হয়। এই টানাপোড়েনটা তো খুব ভীষণভাবেই মানসিক বা বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে সত্য। তো, এইটাকে ফেস্ করতে করতে আপনার শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সেইটা কি কোনোভাবেই কোনো চাপ সৃষ্টি করে ? ভবিষ্যতের কাজটার ক্ষেত্রে? কিংবা অ াপনি যখন থিয়েটারের কোনও নতুন কাজে হাত দেন, যখন একটা নাটক প্রযোজনা করার জন্য মনস্থ করেন, তখন এই টানাপোড়েনটা কীভাবে ক্রিয়া করে?

বিভাস - না, আমার নাটকের ক্ষেত্রে আমি চিরকালই খুব সৎ। আমি একটা জিনিস বলেছি, শুধু সাংগঠনিক কারণে দু - একটা সময়ে খুব পছন্দ হয়েছে, ভেতর থেকে করতে চাই এরকম নাটক করিনি। সেটুকুকে তুমি আপোশ বলতে পারো কিংবা আমার স্খলন বলতে প ারো, কিন্তু তাছাড়া নাটকের বিষয় নির্বাচন, নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি সর্বদাই সৎ থেকেছি। দুটো জিনিস আমাকে ভাবায় সেটা হচ্ছে---একটা নাটক নির্বাচনের সময়, সেটা হচ্ছে নাটকে যা বলছে আমার কথাগুলো তাই কিনা। কিংবা এই নাটকটাকে অবলম্বন করে আমি আমার কথাগুলো বলতে পারি কিনা। নাটকে হয়ত ততটা শার্প করে নেই, ততটা তীক্ষ্ণ, তীব্রভাবে নেই আমি সেটাকে অবল ম্বন করে আরো সেটাকে তীক্ষ্ণভাবে বলাতে পারি কিনা আমার কথাগুলো। এটা সবসময়ই, যে নাট্যকারের নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচালকের যে নিজস্ব অভিজ্ঞতা যেটা যুক্ত হয়েই সেটাকে থিয়েটার করে তোলে। অভিজ্ঞতা মানে শুধুমাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, শিল্পের অভিজ্ঞতা, নাট্যের অভিজ্ঞতা। আরেকটা ব্যাপার আমাকে আকর্ষণ করে,মানে আরেকটা কথা আমি ভাবি নাটক নির্বাচনের

সময়। সেটা হচ্ছে এই নাটকটা করতে গিয়ে আমি থিয়েটারের ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে কি নিজেকে প্রসারিত করতে পারব। সেইটা আমার একটা অন্বেষণ থাকে। যে এই নাটকটা যেভাবে আছে, আমিযদি আমার মতো করে এই নাটকটা করি। তাহলে আমি আগে যা করেছি, তার পুনরাবৃত্তি হবে না তো ; কিংবা অন্যেরা যা কাজ করেছেন তার পুনরাবৃত্তি হবে না তো। যাই হোক নতুন কিছু হবে তো এইটা আমার একটা সব সময় চিন্তা থকে। এছাড়া যে চিন্তাগুলো প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা যাকে বলে, আমার দলের ছেলেমেয়েরা আছে তো, আমার দলের সেই আর্থিক সামর্থ আছে তো। এই নাটকটা এত খরচ করে করব কিন্তু এই নাটকটা কোথায় করব যেখানে করতে চাই সেখানে করতে পারব তো। সেটা মানুষ একেবারেই গ্রহণ নাও করতে পারনে, এটাও হতে পারে, তখন আমাকে পিছিয়ে আসতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। কারণ যেভাবে করতে চাই সেভাবে করতে পারব না। আপোশ করতে হবে, আপোশ করলে মানুষ গ্রহণ করবে না এটা আমি নিশ্চিত। যে নাটক যেভাবে করা উচিত সেভাবেই করা উচিত । মানে আমি যেভাবে ভাবছি। আবার আরেকজন অন্যভাবে ভাবতে পারে। কিন্তু আমি যেভাবে ভাবছি সেভাবেইকরা উচিত, সেটা যদি না পারি সেখান থেকে পিছিয়ে আসা উচিত। কারণ সেখানে আমার অভাবটা যদি লোকের চোখে পড়ে যায়, আমার দৈন্যটা যদি লোকের চোখে পড়ে যায় তাহলে সেটা না করাই আমার উচিত। এরকম নাটক, কিছু কিছু নাটক আছে যেগুলো করা থেকে আমি বিরত থেকেছি। এই কারণে। আর যেগুলো... সেগুলোর কথা না বলাই ভাল অভিনেতা, অভিনেত্রী, সংগঠনের বর্তমান চেহারা এগুলো নিয়ে এতো চর্চা হয়, বলা হয়, এগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব না। এগুলো অনেক সময় বাধার সৃষ্টি করে। কী প্রশ্নটা কী ছিল?

স্যাস্ - কম্প্রোমাইজ নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে কিনা? আর মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে কী কী জিনিস মাথায় রাখব।
বিভাস - হ্যাঁ, এই মূল বিষয় দুটো -- একটা হচ্ছে বিষয়, আরেকটা হচ্ছে যে এই নাটকটা মঞ্চায়নের মাধ্যমে আমিকোনো নতুন পথে হাঁটতে পারব কিনা। থিয়েটারে নতুন কোনো পরীক্ষা - নিরীক্ষা করতে পারব কিনা এই নাটকটার মাধ্যমে, সেটা সবসময়ই আমার চিন্তা থাকে। নতুন কোনো স্টাইল, নতুন কোন রূপ, নতুন কোনো ভঙ্গি এই ব্যাপারটা সব সময়ই কাজ করে। নিজেকে রিপিট করতে চাই না কখনওই। হয়ে যদি যায় কখনও, জানি না হয়েছে কিনা কিন্তু সচেতনভাবে করিনি।

স্যাস্ - না, বিভাসদা, এই যে আপনি বলছেন নিজেকে রিপিট করতে চাইনা, এই জায়গাটায় আমার একটা প্রশ্ন জাগে মনে, এই যে রিপিট করতে চাই না এটা কোন লেভেলে আপনি বলছেন রিপিট করতে চাই না। কিন্তু একটা মানুষ তো আসলে আমার মনে হয়, এটা আপনার কি মনে হয় আপনি বলবেন... আসলে একটা মানুষ তো সারাজীবন ধরে একটাই নির্মাণ করে। একটাই নির্মান, সেখানে সে ধীরে ধীরে বিল্ড করে সেটাকে, বা ত্রিয়েট করে যদি আপনি বলেন---ত্রিয়েট করে বা বিল্ড করে সেটাকে একটাই নির্মাণ কিন্তু ; আমি যেটা ধরতে চাইছিলাম বা আপনার কথা থেকেও যেটা বেরোচ্ছিল যে আপনার আজ পর্যন্ত থিয়েটারের যে কাজ তার ভেতর ধারাবাহিকতা, তার ভেতরেএকটা বিশেষ ধরণ যেটাকে আমি বলব বিভাস চক্রবর্তীর ধরণ, তার প্রেক্ষিতে এই যে বলছেন---নতুন, রিপিট করব না, সেটা একটা অন্য মানে তৈরি করেনা, যদি পুরোপুরি ক্লারিফায়েড্ না হয়। মানে আমি বলছি আরো বড় পারস্পেকটিভে, আপনি দেখুন আমার অনেকগুলো ধরণ দেখতে পাই থিয়েটারে। একটা একটা ডিরেক্টরকে ধরে একএকটা ধরন বলা হয়। আমি আগেও বলেছি এই কথাগুলো, পিটার ব্রুককে একটা ধরণ বলা হয়। স্তানিস্লাভস্কিরঅভিনয় শিক্ষার পদ্ধতি আলাদা। আমাদের এখানে সেভাবে চর্চা হয়নি, হয়ত কিংবা সেরকমভাবে আমার জ্ঞানে নেই। যে শম্ভু মিত্র-র যে ধরণ, তাঁর থিয়েটার - দর্শন সেইটাকে একটা রূপ দেওয়া, তাঁর টোটাল কাজটাকে বিচার করে, অজিতেশের টোটাল কাজটাকে বিচার করে। উৎপল দত্তের টোটাল কাজটাকে বিচার করে, এই পারসপেকটিভে আমি বলছি, আপনি যখন রিপিট করতে চাই না বলেন তখন এই কথাটার মান্যতা পাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়না কি, যে বিভাস চক্রবর্তীর কোনো নিজস্ব ধরণ নেই?

বিভাস - আমার কাজের মধ্যে বিষয়গত দিক থেকে যে একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় সেটা হচ্ছে আমার নির্মাণের মেদণ্ড। কিন্তু এই মেদণ্ডের ওপর যে শরীরটা তৈরি হয়, সেই শরীরটাকে অলংকৃত করে আমার বিভিন্নভাবে নাটকগুলোকে সাজানোর মধ্যে। অর্থাৎ রিপিট না করা মানে, যে আমি যে অলংকারে আমার নাট্যজীবনকে নির্মাণ করছি তাকে বিভিন্ন অলংকারে সাজাতে চাই। সেই বিভিন্ন অলংকারই হচ্ছে তার বৈচিত্র! বৈচিত্রটাই হচ্ছে অলংকার যাতে সে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং মানুষেরা যেন তার দিকে তাকিয়ে না বলে-- উনি তো এইভাবে কথাটা বলবেন, জানাই। এই যে নতুনভাবে বলা--- কথাটা একই হয়ত একই মানে আমি রিপিট বলছি না, কারণ আমি মানুষের বিষয় কথা বলছি, আমি আমার সমসময় নিয়ে কথা বলছি, আমি দেশকাল নিয়ে কথা বলছি, তার নানা দিক বিষয় আসছে কিন্তু মূল ধারাটা এটা হচ্ছে কিন্তু তার মধ্যে--- এগুলো বলছি কিন্তু নতুন ভাবে বলার চেষ্টা করছি। তাতে মনে হয় থিয়েটারের সমৃদ্ধি ঘটে আমার নিজের ব্যক্তিগত, সার্বিকভারে ঘটে কিনা আমি জানিনা, সেটা অন্যলোকে বলবে। কিন্তু আমার থিয়েটারে সমৃদ্ধি ঘটে, আমার থিয়েটারটা মনে হয়, তুমি যেটা নির্মাণের কথা তুমি বললে সেটা সুন্দর হয়ে ওঠে। সেটা অলংকৃত

হয়ে ওঠে। সেটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । এটাই বলতে চাইছি আমি। একইভাবে কথা বলা নয়। আমি যদি একইভাবে দু-ঘন্টা কথা বলি কিছুক্ষণ পরে... এই ইন্টারভিউটা নিতে নিতে তোমার ঘুম আসছে, চোখে ঘুম আসছে, আমি কিন্তু নতুন বিষয় নিয়ে বলছি, কিন্তুআমার বলার মধ্যে কিছু নতুনত্ব পাচ্ছি না। আমি নানারকমভাবে কায়দা করে গলা উঠিয়ে নামিয়ে, নানা রকমের বাচনে স্বরক্ষেপণের তারতম্য ঘটিয়ে তোমাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারছি না। সেখানে কিন্তু একটা বোর্ডম আসছে অ ামার কথায়। তার জন্য তুমি তোমার...মাঝেমাঝে বিশেষ করে খাওয়ার পরের অংশটা
স্যাস্ - খাওয়া বেশি ভাল হয়ে গেছে।

বিভাস - হ্যাঁ, সেটাই দেখছি যে তোমার চোখ ---এইটা যাতে না হয়, আমার থিয়েটার দেখে। লোকে যাতে না বলে যে, ও তো এইভ াবেই কথা বলবে। ও স্টেজে উঠে একটা অভিনেতা ও আগেরটাতে যেরকম হেসে ছিল এটাতেও সেরকম হাসবে ওর শরীরের চলাফের া তো একই রকম হবে, ওর মুদ্রাদোষগুলি নিয়ে, ম্যানরিজমগুলো নিয়ে একই রকম কথা বলবে একই রকম হাসবে, একই রকম লয়ে কথা বলবে, এরকম অভিনেতা তো আছে আমাদের, আছে তো? জানতো? জান না ? এই সূক্ষ্ম তারতম্যগুলো নিয়ে আসতে পারে না তারা। ঠিক তেমনি উপস্থাপনার মধ্যে, উপস্থাপনাগত দিক থেকে এই নতুনত্বের সন্ধান কিন্তু প্রাণ দেয়, নাটককে জীবন্ত করে তোলে। ন াটককে আকর্ষণীয় করে তোলে। এইটাই বলছি, রিপিট মানে ওইখানটা।

স্যাস্ - আচ্ছা বিভাসদা আমি শেষ একটা প্রশ্ন রাখছি আপনার কাছে--- সেটা হচ্ছে যে, এই যে আপনি এতদিন ধরে থিয়েটার করেছেন, আপনার নিজের থিয়েটার, এতদিন ধরে থিয়েটারের সঙ্গে রয়েছেন, আপনার বাইরে---আপনার কাজের বাইরে অন্যরা অনেক কাজ করছেন সেই অভিজ্ঞতা রয়েছে আপনার। প্রায় ৪৫ বছরের থিয়েটারের সঙ্গে আপনার সংযোগ। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে, এই সময়ে দাঁড়িয়ে, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থিয়েটারের বিষয়ে আপনার আকাঙ্খা, আপনার ব্যক্তিগত, নিজের থিয়েটার বিষয়ে বা থিয়েটার এজ অ্যা হোল আপনার আকাঙ্খাটা কি ?

বিভাস - দ্যাখো, এইসব প্রশ্ন করলে আমি না পজেটিভ কথা খুব বলতে পারি না, তখন আমাকে হতাশ মনে হতে পারে। আমাকে হতাশ াবাদীর দলে অনেকে ফেলে অনেক সময়। কিন্তু আমার সে হতাশা আমার রাগ থেকে, ক্রোধ থেকে, যন্ত্রণা থেকে। কারণ আমার মনে হয় অনেক কিছু করা যেত, যায়, কিন্তু হবে না এটা আমি জানি। ঠিক যেরকম বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করেছিলাম। সেরকম স্বাধীনতার পরে আশা করেছিলাম যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে একটা অন্যরকম দেশ হবে, নতুন দেশ হবে, আমরা ম াথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। চারিদিকের মানুষ, সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে, সাধারণ মানুষের মঙ্গল হবে সেটা হয়নি। বামফ্রন্ট ২৫ বছর ধরে আছে, আশা করেছিলাম এই বামফ্রন্ট সীমিত ক্ষমতার মধ্যে অনেক কিছু করতে পারবে, কিন্তু চোখের সামনে আস্তে অস্তে সমস্ত আমাদের বাঙালি জীবন, বাঙালির অর্থনীতি, বাঙালির রাজনীতি সব কিরকম পচে গেল। এখন যদি বলা হয় তাহলে ভবিষ্যত কী। আমি কি বলব, ভবিষ্যতে নিশ্চয় একদিন ভাল হবে। এটা বলতে পারব না। কারণ যে জায়গায় এখন চেষ্টা চলছে নানারকমভাবে সংস্কারের, মেরামত করার, তাপ্পি দেওয়ার, ফিরিয়ে আনার কিন্তু সেটা আর বোধহয় সম্ভব নয়। কারণ যে লাগাম একবার ছেড়ে দেওয় া হয়েছে সে লাগামের রাশ টেনে ধরে আর বোধহয় ফেরানো যাবেই না বলে আমি মনে করি। অন্তত অদুর ভবিষ্যতে নয়, যতদিন না একটা বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন ঘটে। এই সিস্টেমে যেভাবে চলছে এই সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে, সেই সিস্টেমের সাহায্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আজকে যে জায়গায় পৌঁচেছে সেই জায়গা থেকে তাকে টেনে তোলা--আমি ওই সমস্ত সস্তা কথা বলছিনা যে শিল্পযতের ক্ষেত্রে টেনে তোলা ইত্যাদি, তা বলছি না, সামগ্রিকভারে মানুষের মূল্যবোধের কথা বলছি-- আর বোধহয় টেনে তোলা যাবে না। সমাজটাকে -- ন ানা অংশে মানুষ, নানা শ্রেণীর মানুষ শোষণ করেছে সমাজট াকে। আসলে তার া নিজেরাই নিজেদের শোষণ করেছে, সেটাই বুঝতে প ারছে না। নিজেরাই নিজেদের ধবংস ডেকে আনছে। আত্মঘাতী বাঙালি সেটাই বুঝতে পারছে না। ঠিক তেমনি থিয়েটারটা যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে? আমি বলব থিয়েটারটা একটা উদ্দেশ্যহীনভাবে... বিভিন্ন একক প্রচেষ্টায় কিছু ভাল কাজ হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে থিয়েট ারের কোন ট্রাডিশন, ধারাবাহিকতা ঐ অর্থে তৈরী হয়নি। আমি বলব বিচ্ছিন্নভাবে কাজ হয়েছে। ভাল কাজ হয়েছে প্রচুর। ভাল ক্ষমত াশীল, সৃস্টিশীল মানুষ এসেছেন প্রচুর কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে, সে আমি গিরিশবাবুদের থেকে ধরেই বলছি এখনও পর্যন্ত। কী করলে কী হত সেটা এখন গবেষণার বিষয়। থিয়েটারটা, আগেও যেরকম বলেছি, সমাজের স্বীকৃতি পায়নি, রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি। থিয়েটারটা হচ্ছে গিয়ে-- আমাদের সমাজটা যদি একটা বিরাট বড় বাড়ি হয়, তার নানারকম কোঠা আছে, অনেক জমি নিয়ে, বাড়িটার মধ্যে থিয়েটার 'সারভেন্টস কোয়াটার' হয়ে রয়েছে। ওখানেই থিয়েটারটা, থিয়েটার কখনও মূল জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়নি। যেরকম হয়েছে শিক্ষ া, যেরকম হয়েছে প্রযুক্তি, যেরকম হয়েছে ব্যবসা - ব্যাণিজ্য যেরকম হয়েছে সংগীত, য়েরকম চলচিচত্র পর্যন্ত অর্বাচীন শিল্পমাধ্যম কিন্তু থিয়েটারটা সেভাবে হয়নি। থিয়েটারটা মার্জিনালাইজ্ড। থিয়েটারের নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আর নেই। থিয়েটার এখন

কেন্দ্রীয় সরকারের এখানে ওখানে দানের ওপর নির্ভর করে চলেছে। রাজ্য সরকার কিছুটা পরিকাঠামোগত সাহায্য করে, কেন্দ্রীয় সরকার কিছুটা আর্থিক সাহায্য করে। তা বলে এত যে লোক কাজ করছে, এত কিছু,... এগুলোর কোন মানে হয় না। সংখ্যা দিয়ে গুণ মাপা যায় না। সেইখানে থিয়েটারের ভবিষ্যত-- উজ্জ্বল কিছু ব্যক্তিবিশেষ ছাড়া আর কী করে বলি। কিছু মানুষ উজ্জ্বল এটুকু বলতে পারি। এমনকি তাদের মধ্যে নতুন প্রজন্মের বেশ কয়েকজন আছে, যাদের কাছে আমরা আশা করতে পারি ইতিমধ্যেই তারা ভাল কাজ করছে। আবার কিছু ভাল কাজ হবে। কিন্তু সামগ্রিগভাবে থিয়েটারের পথ প্রশস্ত হবে না, পথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে--- একথা ভাবার কোন কারণ নেই। আর আমার নিজের আকাঙ্খা? আমি একটা টেলিভি সন সাক্ষাৎকার বলেছিলাম সেটা, সেদিনকে আমার এক আত্মীয় তাঁর সন্তান হারিয়েছেন, পুত্রবধু হারিয়েছেন একই সঙ্গে তার কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে বলছেন, ঐ শোকের মধ্যেও বলছিলেন, যে তোমার ওই কথাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। তুমি বলেছিলে আপনি এখন কী ভাবছেন? আমার বাড়ির সমানে একটা রিক্সা স্ট্যান্ড আছে। সেখানে এক রিক্সাওয়ালা, প্যাসেঞ্জাররা যেখানে বসে, সেখানে বসে পা দুটো চালকের সিটে তুলে দিয়ে সিগারেট টানছে। তাকে গিয়ে বললাম তুমি একটু আমাকে লেক গার্ডেন্স নিয়ে যাবে, সে আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা নাড়াল, বলল যাবো না অর্থাৎ তার যে দিনের কোটা, সেটা হয়ে গেছে, সে আর বাড়তি কিছু করতে চায় না। তা আমারও মনে হয়, আমারও সেই ফিলজফি। আমার যা দিনের কোটা হয়ে গেছে, আমি বাড়তি কিছু করতে চাই না। করতেই হবে, না করলে আমার ইতিহাসে নাম থাকবে না, না করলে আমি রেসের মধ্যে ধাকতে পারব না, আমার কোন আকাঙ্খা নেই। আমি অত্যন্ত আনএ্যমবিশাস একটা লোক। থিয়েটার আনন্দের জন্যে করি ভালবেসে করি। যতদিন আনন্দ থাকবে ততদিন থিয়েটার করব। হ্যাঁ, থিয়েটার নিরানন্দহয়ে যাচ্ছে ক্রমশই। সুতরাং সেখানে আমি ভবিষ্যতে কী, অদূর ভবিষ্যতে কী করব... এমনিও শারীরিক দিক থেকেও বয়সে হয়েছে, থিয়েটারে শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলব।। ভীষণ শারীরিক শক্তি দরকার হয় থিয়েটার করতে গেলে, যেটা হারাতে পারি। কিন্তু এমনিতে বলছি মানসিক দিক থেকেও আমি ওরকম, ওটাই আমার ফিলজফি। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছি, মানে এশিয়ার সর্বশেষ্ঠ কলেজ তখন, সেখানেও পড়ে আমি বুঝেছি, যদি প্রায় নাও পড়ি, ফাঁকি দিই তাহলেও আমি ভাল রেজাল্ট করতে পারব। যদি ব্লিলিয়ান্ট রেজাল্ট করতে হয় তা হলে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে। আমি দেখতাম যে প্রচণ্ড পরিশ্রম না করে বরঞ্চ হ্যাঁ, ঠিক আছে আমি যদি নিজের ইচ্ছামতো, অলসভাবে আমি যদি পড়াশুনা করি তাহলে মোটামুটি ভাল রেজাল্ট হবে সেটাই আমার ফিলজফি। খুব আনঅ্যাম্বিশাস নেগেটিভ শোনাতে পারে কিন্তু আমি আমার থিয়েটার সম্পর্কে এই কথাই বলছি।

স্যাস্ - না আপনি এই যে বলছেন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, অবস্থাটা খুব খারাপ থিয়েটারের , ধারাবাহিকতা তৈরী হয়নি কোনো, কেন?

বিভাস - শোনো এই প্রতিটি লোক, আমরা যারা এইসব নিয়ে আলোচনা করি সাক্ষাৎকার নেয়, টেলিভিশনে আলোচনা হয়, বড় বড় মোটা ভলুমের পত্রিকা বেরোয়। বার্ষিকী সংখ্যা বেরোয় , নাটক নিয়ে অমুক নিয়ে তমুক নিয়ে সববাই, জানে এই অবস্থাটা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই জানে। এই যে এতগুলো নাট্যগৃহ বন্ধ হয়ে গেল। এইয়ে এতগুলো বাংলা সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গেল 'রূপবাণী'র মত -- রবীন্দ্রনাথের নাম দেওয়া রূপবাণী। আমাদের ছোটবেলায় গমগম করত কী সুন্দর হল, সেখানে গেলেই ভাল লাগত। লবিটি কি সুন্দর, মাঝখানে একটা খোলা জায়গা, ভেতরে হলটা কি সুন্দর--- সেই হল বন্ধ হয়ে গেল। আরো অনেকগুলো হল বন্ধ হয়ে গেল। বাংলা সিনেমা দেখানো বন্ধ হয়ে গেল কে কে চিন্তিত এ নিয়ে। এই যে শহরে এতগুলো যানবাহন চলছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যানবাহন চলছে, অতিরিক্ত... মানে চাইলেই লাইসেন্স দিয়ে দিচ্ছে, তাতে সরকারের কোষাগারে টাকা পড়ছে আর কিছু লোক আলাদা করে টাকা পাচ্ছে পকেটে। সেইজন্যেও লাইসেন্স দিনের পর দিন দেওয়া যাচ্ছে, সেখানে কোন স্টাডি নেই, সেখানে কোন সমীক্ষা নেয় যে কতগুলো লাইসেন্স দিতে পারি না। কতগুলো ট্যাক্সি বের করা দরকার, কতগুলো বাস দরকার এবং সেগুলো নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে মানুষ মারাছে। তোমার আমার ঘরের ছেলেমেয়েরা যখন বেরোচ্ছে, আমি জানি না তারা ফিরে আসবে কিনা। এই যে একটা বারবারই কেবল আনসিভিলাইজড অবস্থা চলছে শহরের বুকে, হুজ বদার। হু কেয়ার। এই যে গড়িয়াহাটের ওপর একটা ফ্লাই ওভার করেছে---একটা অ্মীল, অ্মীল একটা ফ্লাই ওভার করেছে যেটা ওই অঞ্চলটার যা কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা নষ্ট করে দিয়েছে, প্লাস যানজটও বাড়িয়েছে দুধারে, যেটা আমার মত লে ম্যানও বুঝতে পারে। তার জন্যে কোন সমীক্ষা করা হয়েছে,তার জন্যে কোনরকম ভেবে দেখা হয়েছে, সার্ভে হয়েছে দেখতে পারবে ?

স্যাস্ হ্যাঁ, হ্যাঁ, থিয়েটারের জায়গাটাতে---

বিভাস - সবাই এক।

স্যাস্ - হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আমার কথাটা বলি, থিয়েটারের জায়গাটাতে আপনার এই যে---

বিভাস - এই যে এদিকে দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা ওদিকে এই ---

স্যাস্ - হ্যাঁ,

বিচার - এগুলো হচ্ছে, এগুলো হু ইজ বাদার। পর্টি যারা চালায় তারা কি মনে করে ঐরকম একটা জায়গাতেই খালি এরকম হচ্ছে,

একজনই দুলাল আছে, দুলালের পরে এরকম অনেক দুলাল আছে। আলালের ঘরে দুলালের মত। (সমবেত হাসি)।
স্যাস - লালের ঘরে দুলাল---
বিভাস - অনেক আছে - এরকম লালের ঘরে দুলাল অনেক আছে। হু ইজ বদার। কারণ যারা চালাচ্ছে, তারা জানে পারব না তেমনি আমি থিয়েটার চালাচ্ছি, আমি জানি পারব না, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, অনিল বিশ্বাস জানে পারবে না। তেমনি বিভাস চক্রবর্তী , অণ মুখোপাধ্যায়ও জানে পারব না।

স্যাস্ - না এতো আপনি সব ঠিক কথা বলছেন। থিয়েটার যাকে টার্গেট স্পেক্টেটর করেছিল সেই মিডিল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস এর পারসপেকটিভ। এই যে কম্প্রোমাইসের জায়গাটা, রটন জায়গাটা , গোটা মিডল ক্লাসটাই তো তার মধ্যে ঢুকে গেছে। কিন্তু আজকে দেশে, হয়ত সারা পৃথিবীরই ওয়াকিং ক্লাসের যে জায়গাটা আনঅর্গানাইজিড সেক্টর---কারণ আমাদের দেশে ৯০ শতাংশ ওয়ার্কার কিন্তু আনঅরগানাইজড্ সেক্টরের, সেই আনঅরগানাইজড্ সেক্টরের ওয়ার্কাররা, তাদের দেওয়ালে পিঠটা ঠেকে গেছে, সেখানে কিন্তু জমি তৈরি, ঠিক যেমন উনিশশো ষাটের দশকে, পঞ্চাশের দশকে ঐ লোয়ার মিডিল ক্লাস যে ভাবে সামনে এগিয়ে এসেছিল এবং সেখানে থিয়েটার তাদের কাছে বড় অস্ত্রও হয়েছিল। যে কারণে বোধহয় ঐ পিরিয়ডটায় থিয়েটার অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিল। আজকের তুলনায়। জনপ্রিয়তার অনেক বেশি সামাজিক মূল্য ছিল। তাকে ফিল করা যেত। তাকে ইগনোর করা যেত না, আজকে তো ইগনোর করছে সবাই। আমরা যদি প্রেমিসটা পাল্টে ফেলি, আজকে যদি লোয়ার মিডল ক্লাস বা মিডল ক্লাসকে টার্গেট না করে শিফট করে চলে যাই যদি আমরা সেই দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ওয়ার্কিং ক্লাসের কাছে তাহলে কি থিয়েটার গুত্ব ফিরে পাবে?

বিভাস - আমি জানি না, আমাদের এখানে শিক্ষার এমন অসমবিকাশ, অর্থনৈতিক এতো তারতম্য, বৈষম্য রয়েছে যে এটা কিভাবে যাবো, তার মোডাস অপারেণ্ডি কি হবে, তার লজিকস্টিক কী হবে আমার জানা নেই। মানে তুমি বলছ যে, মধ্যবিত্ত যে সম্প্রদায় ছিল এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আমি মিছিলে হাঁটতে দেখেছি, আগের কোন দাঙ্গাতে বা এরকম কোন এতে, এখন যেরকম একটা শ্রাদ্ধবাড়িতে আমরা দেখি শ্রাদ্ধ চলছে কিন্তু সেখানে আত্মীয় - স্বজনরা হ্যা-হ্যা হু-হু করছে। ---এ ওর শাড়ি দেখছে, অন্যরকম - আমার মেয়ে বলে একি এতো শোকের কোন আবহাওয়াই নেই দেখি। অনেক শ্রাদ্ধবাড়িতে আমরা এরকম দেখি, ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা গুজরাটনিয়ে মিছিল হলে কিংবা দাঙ্গা নিয়ে মিছিল হলে সেখানে অন্য কথাগুলো আশপাশে যদি কান পাতো তো দেখবে যারা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে তারা হ্যা - হ্যা - হু-হু করে অন্য কথা বলছে। কে কোন সিরিয়ালে আছে দেখে নিও, তোমার আমেরিকা যাওয়ার কি হল, সেটা ইয়ে হয়েছে, সেটা ইয়ে---এই সমস্ত নানা খবরের লেনদেন। অ্যাকাডেমির সামনে তুমি যদি ক্রাউডটাকে দেখ, তাদের সাথে সংস্কৃতির যে কোন যোগাযোগ নেই সেই পরিবেশটা যে বিষময় হয়েছে... কেউ চেষ্টা করেছি আমরা সেটাকে সুন্দর করে তুলতে ! আমরা যেখানে কাজ করি সেখানেই আমরা আবার... ওই খারাপ শব্দটা... আমরা হেগে ভরিয়ে দিই। আজকে নন্দন কিংবা অ্যাকাডেমিক জায়গাটা যে এই দাঁড়িয়েছে, এইগুলো হচ্ছে পরিচয় সূচক, এইগুলো থেকে বোঝা যায় কত রট্ন করে গেছে আমাদের সমাজটা। এবং তুমি যেটা বলছ সেইখানে যাবো কিনা, আজকে ওয়াকিং ক্লাস তো মার্জিনালাইজ্ড। তাদের তো শেষ করে ফেলা হয়েছে। ওয়াকিং ক্লাস বলে কিছু আছে নাকি। তাদের আন্দোলন দাবি - দাওয়া এই - সেই এসব নিয়ে কেউ ভাবে নাকি। মধ্যবিত্ত আগে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতো, এখন ভাবেই না। তারা নেই।
স্যাস্ - সেই জন্যই তো তাদের পাশে...
বিভাস - পঁচিশ বছরে বাম জমানাতে সব চেয়ে যদি সাফারার হয়ে থাকে, সে তো এই শ্রমিক শেণী।
বিভাস - কে দাঁড়াবে ? আমি নই, আমি দাঁড়াচ্ছিনা এটুকু জানি।
স্যাস্ - না ---আমি বলছিলাম ধণ দারিও ফো যেভাবে নাটক করেছেন।
বিভাস - নতুনরা কক। এটা আমি চাই ঠিকই, ফর্ম বের করা উচিত। বাদলবাবুর মতো নয়। দারিও ফো-র মতো করা উচিত।
স্যাস্ - দরকার হলে আমি বলছি যে সমস্ত ছোট ছোট লেভেলে হয়তো কিছু অরগানইজেশনস্ কাজ করছে পলিটিক্যাল কিংবা পলিটিক্যাল মত নিয়ে আপলিটিক্যাল একটা এন জি ও, এদের সঙ্গে কোলাবরেট করে থিয়েটার কী আরো ভেতরে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঢুকতে পারে ?
বিভাস - জানি না। এ বিষয়ে আমি একদম বলব না। আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

স্যাস্ নাট্যপত্রের পক্ষে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন হর ভট্টাচার্য।